# একনজরে হজ্জের আমলসমূহ ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা

হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

## একনজরে হজ্জের আমলসমূহ

হজ্জ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। বিত্তবানদের উপর জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরয; বিলম্ব না করা ওয়াজিব। আর স্বাস্থ্য অনুকূল হলে এবং আর্থিক সঙ্গতি থাকলে প্রতি চার বছরে একবার বাইতুল্লাহ শরীফে নফল হজ্জ বা উমরার উসীলায় হাজির হওয়া বাইতুল্লাহ শরীফের হক।

**৭ই যিলহজ্জ : মিনায় রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতিমূলক ৫ কাজ**

১. চার বা পাঁচ দিনের জন্য জরুরী সামান নিয়ে হাতব্যাগ প্রস্তুত করা।

২. বড় লাগেজ বাসায় রেখে যাওয়া।

৩. ইহরাম বাঁধার পূর্বে শরীরের অবাঞ্ছিত লোম, নখ, চুল, মোচ ইত্যাদি কেটে নেয়া।

৪. হজ্জের ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ

(ক) উযূ/ গোসল করে দুই রাকআত নামায পড়া।

(খ) হজ্জের নিয়ত করে [পুরুষগণ সশব্দে আর মহিলাগণ নিঃশব্দে] তালবিয়া পড়া।

৫. নফল তাওয়াফ করে হজ্জের সাঈ করে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল (বীরদর্পে হাঁটা) এবং পূর্ণ তাওয়াফে 'ইজতিবা' করা সুন্নাত। 'ইজতিবা' হলো– শরীরে পরিহিত চাদর [বাম কাঁধ ঢেকে ডান কাঁধের নিচ দিয়ে নিয়ে] দুই প্রান্তকে বাম কাঁধের উপর রাখা এবং ডান কাঁধ খালি রাখা।

**৮ই যিলহজ্জ : মোট ৪ কাজ**

১. মিনা ময়দানে অবস্থান করা।

২. বেশি বেশি তালবিয়া পড়া।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা।

৪. বেশি বেশি তিলাওয়াত ও যিকির করা।

**৯ই যিলহজ্জ : মোট ৭ কাজ**

১. সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওয়ানা হওয়া।

২. যোহরের নামাযের পূর্বে গোসল করে নেয়া।

৩. যোহরের আউয়াল ওয়াক্ত থেকে বেলা ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দু'আ, দুরূদ ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকা। উল্লেখ্য, যোহরের আউয়াল ওয়াক্ত থেকে পরবর্তী দিনের সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় আরাফা ময়দানে [সামান্য সময়ের জন্য হলেও] উকূফ তথা অবস্থান করা ফরয।

৪. যতক্ষণ সম্ভব কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উকূফ করা ।

৫. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফা ময়দানে অবস্থান করে মাগরিব না পড়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া (ওয়াজিব)।

৬. মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হলে এক আযান ও এক ইকামাত দিয়ে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া। প্রথমে দুই ওয়াক্তের ফরয আদায় করবে, এরপর দুই ওয়াক্তের সুন্নাত আদায় করবে।

৭. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা এবং সেখান থেকে ৭০টি ছোট কংকর সংগ্রহ করা (সুন্নাত)।

**১০ই যিলহজ্জ : মোট ১০ কাজ**

১. সুবহে সাদিকের পরে সম্ভব হলে গোসল করা।

২. বেশি বেশি তালবিয়া, যিকির, দু'আ ও তিলাওয়াত করতে থাকা।

৩. আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত মুযদালিফায় উকূফ করা (ওয়াজিব)।

৪. সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

৫. ১০ তারিখ দিনে শুধু বড় শয়তানকে সাতটি কংকর মারা (ওয়াজিব)। প্রতিটি কংকর মারার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে মারা এবং কংকর মেরে দ্রুত চলে আসা।

৬. ১০, ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যে কুরবানী করা (ওয়াজিব)। উল্লেখ্য, কুরবানীর ব্যবস্থাপনায় নিজেরা থাকা, ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী না করানো। কেননা, ব্যাংকের দায়িত্বশীলগণ নির্ধারিত সময় ঠিক রাখতে পারে না।

৭. মাথা মুণ্ডানো বা এক ইঞ্চি পরিমাণ চুল ছোট করা। (ওয়াজিব)।

উল্লেখ্য, কংকর মারা, কুরবানী করা এবং মাথা মুণ্ডানো– এ তিনটি ওয়াজিব কাজ ধারাবাহিকভাবে করাও ওয়াজিব। ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে 'দম' দিতে হবে।

৮. ১০, ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যে তাওয়াফ করা [ফরয]।

৯. হজ্জের ইহরাম বাঁধার পরপর ৭ই যিলহজ্জ সাঈ না করে থাকলে এ তাওয়াফের [প্রথম তিন চক্করে রমল করে] পরে সাঈ করা।

১০. রাতে মিনায় অবস্থান করা।

**১১ই যিলহজ্জ : মোট ৩ কাজ**

১. বাদ যোহর সূর্যাস্তের আগে আগে তিন শয়তানকে পাথর মারা । পাথর মারার নিয়ম হল–

(ক) ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারি এবং শেষে বড় শয়তানকে পাথর মারা।

(খ) বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে পাথর নিক্ষেপ করা।

(গ) প্রত্যেক শয়তানকে ৭টি করে পাথর নিক্ষেপ করা।

(ঘ) ছোট ও মাঝারি শয়তানকে পাথর মারার পর সামনে অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী অবস্থায় তাসবীহ, তাহলীল ও দু'আ করা। তবে বড় শয়তানকে পাথর মেরে সেখানে দাড়িয়ে দু'আ করবে না; বরং দ্রুত সেখান থেকে চলে আসবে।

২. ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে করে নেওয়া।

৩. রাতে মিনায় অবস্থান করা।

**১২ই যিলহজ্জ : মোট ৩ কাজ**

১. বাদ যোহর সূর্যাস্তের আগে আগে তিন শয়তানকে উল্লিখিত নিয়মে পাথর মারা।

২. ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজ সূর্যাস্তের আগেই তাওয়াফ করে নেওয়া জরুরী।

৩. রাতে মিনায় অবস্থান করা।

**১৩ই যিলহজ্জ : মোট ২ কাজ**

১. বাদ যোহর তিন শয়তানকে উল্লিখিত নিয়মে পাথর মারা এবং মক্কায় ফিরে আসা।

উল্লেখ্য, ১০, ১১ ও ১২ তারিখে পাথর মারা ওয়াজিব তথা আবশ্যক হলেও ১৩ তারিখে পাথর মারা আবশ্যক নয়; বরং সুন্নাত।

২. মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা। (ওয়াজিব)

## মা'যূর ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য 'ওয়ানওয়ে হজ্জ'

মা'যূর ও অক্ষম ব্যক্তিগণ ১০ই যিলহজ্জের আগ পর্যন্ত অন্যান্য

আমলসমূহ স্বাভাবিক নিয়মে আদায় করবে। অতঃপর–

**১০ই যিলহজ্জ করণীয়: মোট ২টি**

১. ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর 'উকূফে মুযদালিফা' শেষ করে সূর্যোদয়ের একটু পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং সারাদিন মিনায় অবস্থান করবে।

২. তারপর এ দিন বিকেলে বা রাতে শুধু বড় শয়তানকে পাথর মেরে সোজা মক্কায় চলে আসবে এবং রাতে মক্কায় অবস্থান করবে।

**১১ই যিলহজ্জ করণীয়: মোট ৭টি**

১. মক্কায় ১১ই যিলহজ্জ সকালে নাশতা খেয়ে নিজেরা যাবে ফরয তাওয়াফ ও সাঈ করতে আর কাফেলার যুবকরা নিজেদের এবং এ সকল মাযূর ব্যক্তিদের পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য 'হালাকা' বা 'নাক্বাসা' মার্কেটে যাবে। এদিকে মাযূররা তাওয়াফ, সাঈ শেষ করবে আর ওদিকে যুবকরা কুরবানী করে ফেলবে।

২. কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে মাযূরগণ 'হলক' করে ফেলবে। অর্থাৎ সেলুনে গিয়ে বা নিজেরা পরস্পরে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে স্বাভাবিক পোশাকে ফিরে যাবে।

৩. হালাল হওয়ার পর আছর পর্যন্ত সময়টুকু মক্কায় অবস্থান করতে পারবে এবং বাইতুল্লাহর জামা'আতে শরীক হতে চেষ্টা করবে।

৪. আছরের পর মিনা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

৫. মিনায় পৌঁছে তিন শয়তানকে পাথর মারবে।

৬. তারপর সোজা মিনায় নিজ তাঁবুতে ফিরে যাবে।

৭. ১১ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত ও পরের দিন ১২ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করে যিকির-আযকার ও ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে।

**১২ই যিলহজ্জ করণীয়: মোট ২টি**

১. ১২ই যিলহজ্জ বিকেলে বা রাতে মক্কার উদ্দেশ্যে তাঁবু থেকে বের হবে।

২. পথে তিন শয়তানকে পাথর মেরে মক্কায় চলে আসবে এবং যথারীতি মক্কায় অবস্থান করবে।

উল্লেখ্য, মা'যূর ব্যক্তির জন্য ১৩ই যিলহজ্জ পাথর মারার উদ্দেশ্যে মিনায় ফিরে আসার প্রয়োজন নেই।

## হজ্জ ও উমরাহ : কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা

**ইহরাম প্রসঙ্গ**

অনেককে দেখা যায় অজ্ঞতা কিংবা অসাবধানতাবশত ইহরামের কাপড় বড় লাগেজে দিয়ে দেয়। ফলে ইহরামের কাপড় সাথে না থাকায় তারা বিমানবন্দরে বা মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধে না। এমনটি করলে তাদের উপর 'দম' ওয়াজিব হয়ে যায়।

তারা মনে করে, ইহরামের কাপড় ছাড়া ইহরাম বাঁধা যায় না, অথচ ইহরাম সহীহ হওয়ার জন্য ইহরামের কাপড় পরিধান করা শর্ত নয়; বরং ইহরামের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কেবল দু'টি : এক. উমরাহ বা হজ্জের নিয়ত করা। দুই. তালবিয়া পড়া।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, ইহরাম অবস্থায় শরীরের গঠনমাপে প্রস্তুতকৃত কাপড় পরিধান করা নিষেধ। কাজেই যারা এ ধরণের সমস্যায় পড়বে, তারা সাধারণ কাপড় পরিহিত অবস্থায় বিমান মীকাত অতিক্রম করার ঘোষণা দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়ে নিবে। এর দ্বারাই ইহরাম হয়ে যাবে। তারপর জেদ্দা বিমানবন্দরে লাগেজ হাতে পাওয়ার পর সাধারণ পোশাক খুলে ইহরামের সেলাইবিহীন কাপড় পরে নিবে। এভাবে বিমানে ইহরাম বাঁধার পর জিদ্দায় অবতরণ করে লাগেজ হাতে পেয়ে পরিহিত সেলাইকৃত কাপড় খুলে ফেলতে যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়, এতটুকু সময় সেলাইযুক্ত কাপড় পড়ে থাকার কারণে দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, ইহরাম বাঁধার পর বারো ঘণ্টার কম সময় সাধারণ সেলাইকৃত কাপড় পরে থাকলে দম ওয়াজিব হয় না। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৭৭ যাকারিয়া)

ঢাকা থেকে সরাসরি মক্কাগামী হাজীদের বিমান সাধারণত জিদ্দায় অবতরণের ২০-২৫ মিনিট আগে মীকাত অতিক্রম করে। অনেক বিমানে ঘোষণাও করা হয় যে, বিমান আর দশ মিনিট পর মীকাত অতিক্রম করবে। এটাই ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করার দম থেকে বাঁচার শেষ সময়। তখনও যদি কেউ ইহরাম বেঁধে নেয়, তাহলে তাকে দম দিতে হবে না।

**সফর প্রসঙ্গ**

১. মনে রাখতে হবে, বিমানের মধ্যে এবং বড় লাগেজ হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত যে-সব জিনিস প্রয়োজন হবে যেমন : গামছা, জায়নামায, ঔষধ, কিছু শুকনো খাবার ইত্যাদি– সেগুলো নিজের সাথে রাখবে অর্থাৎ হাতব্যাগে রাখবে, যাতে পথে কোনো অসুবিধা না হয়।

২. জিদ্দায় পৌঁছার পর প্রথমে ইমিগ্রেশন পার হতে হয়। ইমিগ্রেশনের পর সামান্য একটু সামনে এগোলেই সামানপত্র বুঝে নেওয়ার স্থান। কর্তৃপক্ষ বিমান থেকে লাগেজ নামিয়ে সেখানে জমা করতে থাকে। সেখান থেকে নিজের লাগেজ বুঝে নিতে হবে। তারপর একটু সামনে অগ্রসর হলেই কাস্টম চেকইন। সেখানে মেশিনে চেক করানোর পর দরজার কাছে গেলে কুলিরা লাগেজ তাদের গাড়িতে তুলে নিবে। অপরদিকে মুআল্লিমের লোকেরা পাসপোর্টে বাস ভ্রমণের টিকিট লাগিয়ে দিবে। টাকা-পয়সা, টিকিট ইত্যাদি নিজের গলায় ঝুলানো ব্যাগে রাখবেন। এ পর্যন্ত বিমানবন্দরের কাজ শেষ।

৩. এখন বাসে চড়ে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য আপনাকে পায়ে হেঁটে সামান্য দূরে বাংলাদেশ হজ্জমিশনের স্থানে (দরজা দিয়ে বের হয়ে ডান দিকে) পৌঁছতে হবে এবং কুলিরা মাল আনার পর নিজের লাগেজ বুঝে নিতে হবে। তারপর বাসে উঠার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করতে হবে। বিশাল তাবুসদৃশ ঐ অপেক্ষা করার জায়গাকে 'হজ্জ ক্যাম্প' বলে। সেখানে উযূ ইস্তিঞ্জা ও নামাযের সুব্যবস্থা আছে।

৪. আশে-পাশে সৌদির বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির সীম কিনতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি সীমে সাধারণত ক্রয়মূল্যের সমপরিমাণ ফ্রি কথা বলার সুযোগ থাকে। পার্শ্ববর্তী দোকানগুলোতে বিভিন্ন রকমের খাবারও পাওয়া যায়। দাম জিজ্ঞেস করে ক্রয় করলে নিজেকে মানসিক হয়রানী থেকে নিরাপদ রাখা যায়।

৫. ইমিগ্রেশন থেকে নিয়ে বাসে উঠা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে। এ কারণে অধৈর্য হওয়া যাবে না। এমন পরিস্থিতিতে চিন্তা করা দরকার যে, বিমান আবিষ্কৃত হওয়ার আগে মানুষ কত কষ্ট করে হজ্জ করতো। হজ্জের সফরে তাদের কয়েক মাস সময় লেগে যেতো। পথে হাজারো বালা-মুসীবত ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হতো। আর এখন আল্লাহ তা'আলা কতো সহজ করে দিয়েছেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হজ্জযাত্রীগণ সুদূর বাংলাদেশ থেকে মক্কায় পৌঁছে যাচ্ছে। সুতরাং এত সুবিধা লাভের পর সামান্য দেরির কারণে অধৈর্য হওয়া মোটেই উচিত নয়। অপেক্ষার এ সময় অধৈর্য না হয়ে যিকির-আযকার করতে থাকবে। ইহরামের অবস্থায় থাকলে বেশি-বেশি তালবিয়া পড়তে থাকবে। তবে তালবিয়া দলবদ্ধভাবে পড়া ঠিক নয়।

৬. বাসে উঠার পূর্বে লাইনে দাঁড়াতে হয়। সৌদি মুআল্লিমের লোকজন বার

বার লোকসংখ্যা গণনা করে এবং অবশেষে পাসপোর্ট নিয়ে নেয়। এখানে পাসপোর্ট জমা দেয়ার পর পুনরায় দেশে ফেরার সময় জেদ্দায় আসা পর্যন্ত পাসপোর্টটি মুআল্লিমের লোকদের যিম্মায় থাকে। হজ্জ শেষে হাজীগণ যখন দেশে ফেরার জন্য জেদ্দায় পৌঁছে তখন পাসপোর্ট ফেরত দেয়া হয়; এর আগে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না। সুতরাং এ নিয়ে দুঃচিন্তার কিছু নেই।

৭. মক্কায় পৌঁছার পর প্রথমে মুআল্লিমের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন পরিচয়পত্র দেওয়া হয়, যা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয় এবং হাতে পরতে হয়। এসব পরিচয়পত্র যত্নের সাথে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং হাতে পরতে হবে।

৮. এরপর হাজীদেরকে তাদের জন্য ভাড়াকৃত বাসা বা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসা বা হোটেলে গ্রুপ লিডার যে কামরা দিবে, সেখানে নিজের সিট নিবে।

৯. সিট পাওয়ার পর উমরার জন্য তাড়াহুড়া করবে না বরং ধীরে-সুস্থে নিজেকে উমরার জন্য প্রস্তুত করবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে। সম্ভব হলে গোসল করবে। কাপড় পরিবর্তন করে প্রয়োজনে কিছু খেয়ে নিবে। এরপর যারা আগে এসেছে, তাদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে যখন ভিড় কম মনে হবে তখন উমরার নিয়তে বাইতুল্লাহয় রওয়ানা হবে।

**তাওয়াফ প্রসঙ্গ**

১. ভিড়ের মধ্যে হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসতে পেরেছে কিনা, তা বুঝার সহজ উপায় হল, মসজিদে হারামের এক দিকে শুধু একটি মিনার আছে (অন্য সকল দিকে জোড়া মিনার।) সেই মিনার থেকে একটু সামনে অগ্রসর হবে। কিংবা ঐ দিকেই মসজিদে হারামের দ্বিতীয় তলায় সবুজ বাতি জ্বলতে দেখবে, ঐ বাতি বরাবর দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহমুখী হলেই হাজরে আসওয়াদ বরাবর হয়ে যাবে।

২. হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে কয়েকটি কাজ করবে :

(ক) প্রথমত তাওয়াফের নিয়ত করবে। অর্থাৎ এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! আমি উমরার তাওয়াফ করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

(খ) এরপর নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় যেভাবে হাত উঠানো হয় সেভাবে উভয় হাতের তালু হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দিকে ফিরিয়ে বলবে,

بسم الله الله اكبر، لااله الاالله ولله الحمد، والصلاة والسلام على رسول الله

শুধু بسم الله الله اكبر বললেও চলবে। (মানাসিক-১৩০)

(গ) আজকাল ভিড়ের কারণে যেহেতু হাজরে আসওয়াদের কাছে যাওয়া যায় না, তাছাড়া ওখানে খোশবু লাগানো থাকে তাই হাজরে আসওয়াদ ইশারায় চুমু খাওয়াই ভালো। হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে উভয় হাতের তালু হাজরে আসওয়াদের উপরে রাখার মতো করে ইশারা করবে। অতঃপর তালুতে শব্দ করা ছাড়া চুমু খাবে। কেউ যদি কখনো হাজরে আসওয়াদকে সরাসরি চুমু খাওয়ার সুযোগ পায় তাহলে হাজরে আসওয়াদের উপর দুই হাত রেখে দুই হাতের মাঝে পাথরের উপর নিঃশব্দে চুমু খাবে। যদি এভাবে চুমু খেতে না পারে তাহলে সম্ভব হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুমু খাবে। (মানাসিক-১৩১)

**তাওয়াফের সময় যিকির প্রসঙ্গ**

১.এমন কিছু যিকির আছে যেগুলো তাওয়াফের সময় আদায় করলে যিকিরের আমলও হয়ে যাবে, সাথে সাথে কত চক্কর হল এবং এখন কততম চক্কর চলছে তা-ও মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তবে এগুলোকে সুন্নাত মনে করবে না, শুধু বৈধ মনে করবে। যিকিরগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ:

১ম চক্করে سبحان الله পড়তে থাকা।
২য় চক্করে الحمد لله পড়তে থাকা।
৩য় চক্করে لااله الاالله পড়তে থাকা।
৪র্থ চক্করে الله اكبر পড়তে থাকা।
৫ম চক্করে سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم পড়তে থাকা।
৬ষ্ঠ চক্করে যে কোনো সহীহ দুরূদ শরীফ পড়তে থাকা।
৭ম চক্করে যে কোনো ইস্তিগফার পড়তে থাকা।

তবে মনে রাখতে হবে, উল্লিখিত যিকিরসমূহ হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী-এর মধ্যবর্তী স্থান ব্যতীত বাইতুল্লাহর অন্য তিন দিকে পড়বে। কেননা, রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ-এর মধ্যবর্তী স্থানে পড়ার জন্য হাদীসে নিম্নলিখিত দু'আ বর্ণিত হয়েছে,

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب النار

২.তাওয়াফ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা থেকে যিকির করা উত্তম। (আনওয়ারে মানাসেক পৃ. ৩৮২)

**যমযমের পানি পান প্রসঙ্গ**

মাতাফের বিভিন্ন জায়গায় যমযমের পানির ট্যাংক রাখা আছে। কিছু ট্যাংকের গায়ে 'নট কোল্ড' লেখা আছে; সেগুলো স্বাভাবিক পানি। আর অধিকাংশ ট্যাংকের গায়ে কিছু লেখা নেই; সেগুলো ঠাণ্ডা পানি। যার স্বাস্থ্যের জন্য যে পানি অনুকূলে হবে সেটা তৃপ্তিসহ পান করবে। তাওয়াফ থেকে ফারেগ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই পানির চাহিদা সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমও পানি পান করা। এভাবে পরম করুণাময় আল্লাহ বান্দার স্বভাবচাহিদাকে ইবাদাত বানিয়ে দিয়েছেন।

**মুলতাযাম প্রসঙ্গ**

হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মধ্যবর্তী দেয়ালকে 'মুলতাযাম' বলা হয়। এ স্থানটিতে দু'আ কবুল হওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে আজকাল প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সাধারণত অন্যকে কষ্ট না দিয়ে মুলতাযামে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না। আর অন্যকে কষ্ট দেওয়া যেহেতু হারাম, সুতরাং ভিড়ের মধ্যে অন্যকে কষ্ট দিয়ে মুলতাযামে উপস্থিত হওয়া আদৌ সঙ্গত নয়। তাছাড়া আজকাল কে বা কারা কাবা ঘরের দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে আতর লাগিয়ে রাখে। ফলে দেয়াল স্পর্শ করলেই শরীরে বা কাপড়ে আতর লেগে যায়। অথচ ইহরাম অবস্থায় শরীর বা কাপড়ে যে কোনো ধরণের খোশবু লাগানো নিষেধ। তাই এই আশংকার কারণে বর্তমানে ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ শরীফ স্পর্শ করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আর মুলতাযামে উপস্থিত হওয়া এবং বাইতুল্লাহ শরীফ স্পর্শ করা যেহেতু মুস্তাহাব আমল, তাই উল্লিখিত সমস্যার কারণে তা আদায় করতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই।

**সাঈ প্রসঙ্গ**

১. তাওয়াফের সাত চক্করে যে সাত ধরণের যিকিরের কথা বলা হয়েছিল, সাঈর সাত চক্করেও সেগুলো আদায় করতে পারেন। এতে যিকির করাও হবে, আবার চক্করের নম্বরও মনে থাকবে। তবে কোনো ধরণের যিকির না করলেও সাঈ সহীহ হবে।

২. অনেকে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা'য় যাওয়াকে এক চক্কর মনে করে, এ ধারণা ভুল। সাঈ করার স্থানটি বর্তমানে চার তলাবিশিষ্ট। প্রত্যেক তলায়ই সাঈ করা যায়। তাই বেশি ভিড়ের মধ্যে সাঈ না করে যেখানে ভিড় কম থাকে দেখেশুনে সেখানে সাঈ করা ভালো। সাঈর স্থানে সাফা পাহাড় সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে চলন্ত সিঁড়ি আছে, সুতরাং তৃতীয় বা চতুর্থ তলায় সাঈ

করতে চাইলে সেখানে যেতে কোনো কষ্ট হবে না।

**চুল কাটা প্রসঙ্গ**

যখন দলের কয়েকজনের সাঈ শেষ হয়ে যাবে, তখন হাজী সাহেবানরা সেলুনে না গিয়ে একজন অন্যজনের চুল কেটে দিতে পারে। অনেকে মনে করে, 'প্রথমে একজনের চুল সেলুন থেকে কেটে আসতে হবে অতঃপর সে অন্যদের চুল কাটতে পারবে!' এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন।

মক্কার বাজারে ১৫০-২০০ রিয়ালে চুল কাটার উন্নতমানের মেশিন পাওয়া যায়। একা কিনতে না পারলে কয়েকজনে মিলে একটা কিনে নিবে। মেশিন কিনে বাসায় বসে চুল কাটবে। এতে খরচও বাঁচবে, আর চুল কাটার সুন্নাতও আদায় করা সম্ভব হবে। তাছাড়া অন্য ভাইকে সহযোগিতাও করা যাবে। চুল কাটার সুন্নাত হলো, কেবলামুখী হয়ে বসা, মাথার ডান দিক থেকে কাটতে শুরু করা।

**মিনায় অবস্থান প্রসঙ্গ**

১. বর্তমানে হাজীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একসাথে সকল হাজীর জন্য মিনায় স্থান সংকুলান হয় না। এ কারণে অনেক হাজীর তাঁবু মিনা ছাড়িয়ে মুযদালিফার সীমানায় পড়ে যায়। তো এ ক্ষেত্রে মূলকথা হলো, কারো তাঁবু যদি মুযদালিফার সীমানায় পড়ে যায় তাতেও তার মিনায় অবস্থানের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আবার উকূফে মুযদালিফাও ঐ তাঁবুতে করলেই চলবে। এছাড়া ১০ই যিলহজ্জ সকালে মিনায় যেতে হয় সে ক্ষেত্রেও ঐ তাঁবুতে থাকলেই চলবে। তবে কংকর মারার সময় অবশ্যই মিনায় যেতে হবে।

২. মিনায় প্রায় তিন/ চার বেলা খেতে হয়। এই খাবারের ব্যবস্থা তিনভাবে হতে পারে–

ক. মুআল্লিমকে টাকা দিলে মুআল্লিম খাবার সরবরাহ করে।

খ. কখনো গ্রুপ লিডার খাবারের ব্যবস্থা করে।

গ. মিনায় রাস্তার পাশে অনেক রকমের খাবার কিনতে পাওয়া যায় সেখান থেকে নিজেরাও খাবার সংগ্রহ করা যায়।

যদি মুআল্লিমের মাধ্যমে খাবারের ব্যবস্থা করতে চায়, তাহলে প্রতি তিনজনে দু'টি খাবারের অর্ডার দিবে। কেননা, মুআল্লিমের সরবরাহকৃত খানার পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে থাকে। এজন্য তিনজনের জন্য দু'টি খাবার অর্ডার দিলে খাবার অপচয় হবে না। আর কম পড়লে কিনে নিতে পারবে।

**মুযদালিফায় অবস্থান প্রসঙ্গ**

১. আরাফা থেকে মুযদালিফার দূরত্ব ৩/৪ মাইল। আরাফা থেকে গাড়িতে ও পায়ে হেঁটে উভয়ভাবে মুযদালিফায় যাওয়া যায়। তবে গাড়িযোগে গেলে পথ কম হওয়া সত্ত্বেও প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে পথে ইশার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তাই যাদের হাঁটার ক্ষমতা আছে, তাদের জন্য হেঁটে যাওয়াই ভালো।

২. আরাফা ও মুযদালিফার মাঝে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার প্রশস্ত একটা ময়দান আছে। সেখানে অনেক টয়লেট ও গাছপালা আছে। যারা আরাফা থেকে হেঁটে মুযদালিফায় যায় তাদের অনেকে এই মাঠকে মুযদালিফা মনে করে এখানে থেমে যায় এবং অবস্থান নেয়। অতঃপর এখানেই মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করে। অথচ এখানে মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করা জায়েয নেই। সুতরাং ফজরের পরে এখানে উকূফ করলে মুযদালিফায় উকূফ করার ওয়াজিবও আদায় হবে না। যারা এই ভুলের শিকার হবে তাদের উপর দম ওয়াজিব হবে।

**জামারাতে কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ**

১. খোঁজ-খবর নিয়ে যখন ভিড় কম থাকে তখন পাথর মারতে যাবে। পুরুষরা দিনে পাথর মারা শেষ করতে চেষ্টা করবে। সাধারণত রাতের বেলা ভিড় কম হয়, তাই মহিলাদেরকে রাতের বেলা পাথর মারতে নিয়ে যাবে। বর্তমানে ভিড়ের যে অবস্থা, তাতে দুর্বল, মাযূর বয়স্ক পুরুষরাও যদি আসরের পরে বা রাতে পাথর মারতে যায় তাহলে পরিস্থিতির কারণে ইনশাআল্লাহ মাকরূহ হবে না।

২. পাথর মারার স্থানটি কয়েক তলাবিশিষ্ট। এখানে প্রবেশের কয়েকটি রাস্তা রয়েছে। একেকটি রাস্তা একেক তলায় উঠে গেছে। যে তলায় গিয়ে পাথর মারার ইচ্ছা করবে, আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করে সে তলার রাস্তা ধরবে। যে তলায় ভিড় কম হবে বলে মনে হবে, সে তলা থেকে পাথর মারবে। অনেকে প্রতীকী শয়তানের (খুঁটির) গায়ে জুতা, ছাতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে, এটা জায়েয নেই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭)

৩. শয়তানের খুঁটি তিনটি এখন বিশাল দেয়াল আকৃতিতে নির্মিত হয়েছে। ভিড় এড়িয়ে এই দেয়ালের পশ্চিম পার্শ্বে চলে গেলে ভিড় অনেক কম হয়। এ সুযোগ নেয়া যেতে পারে।

**কুরবানী প্রসঙ্গ**

১. কুরবানী দুইভাবে করা যেতে পারে–

এক. মিনার উত্তর পাশে 'মুআইসীম' নামক একটা ক্যাম্প আছে। যে কেউ ওখানে গিয়ে ছাগল-দুম্বা কিনে নিজ হাতে জবাই করতে পারে। অথবা ওখানে যারা পশু বিক্রি করে তাদেরকে বললে তারা সামনেই জবাই করে দেয়।

দুই. মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে তিন মাইল দূরে 'হালাকা' ও 'নাক্কাসা' নামক পশু বিক্রির দুইটি বাজার আছে। কেউ চাইলে ঐ বাজারে গিয়ে পশু কিনে কুরবানী করতে পারে। আবার এমনও করা যেতে পারে যে, পুরো কাফেলার পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য ৪/৫জন লোক বাজারে যাবে। তারা পশু কিনে প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন নিয়ত করে জবাই করবে।

২. বর্তমানে অনেকে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করায়। অথচ ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করানো সতর্কতার পরিপন্থী। কেননা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে সময়ে কুরবানী করার কথা বলে, সাধারণত সে সময়ের মধ্যে কুরবানী করতে পারে না। তো যদি তাদের দেয়া সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে মাথা মুণ্ডানো হয় বা চুল ছাঁটা হয়, আর কুরবানীর পশু তখন পর্যন্ত জবাই করা না হয়, তাহলে কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডানোর অপরাধে দম ওয়াজিব হবে। অথচ সে জানতেই পারবে না যে, তার উপর দম ওয়াজিব হয়েছে। কারণ, তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর জন্য কুরবানী করার আগে মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা নিষেধ। তাই যথাসম্ভব ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করাবে না।

তবে, কেউ যদি কোনো উপায়ে নিশ্চিত হতে পারে যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার কুরবানী করে দিয়েছে, তাহলে তখন হলক করতে কোনো সমস্যা নেই এবং সেক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে বাস্তবতা হল, এটা জানা সম্ভব হয় না। তাই এই ঝুঁকি নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

**১০ ই যিলহজ্জ-এর আমল প্রসঙ্গ**

মিনা থেকে কংকর মেরে মক্কায় যাওয়ার দু'টি পদ্ধতি হতে পারে–

এক. পায়ে হেঁটে যাওয়া। বড় শয়তান থেকে সামান্য পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বাম দিকের টিনশেড-এর রাস্তা ধরে টানেলের ভিতর দিয়ে মক্কায় চলে যাওয়া। এখান দিয়ে হেঁটে মক্কায় পৌঁছতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগে।

দুই. গাড়িযোগে যাওয়া। যারা গাড়িতে যেতে চায় তারা 'আযীযিয়া' কিংবা 'বিন দাউদ' নামক স্থান থেকে গাড়িতে উঠতে পারে। পাথর মারার স্থান থেকে সামনের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে বাম দিকের রাস্তায় সামান্য এগোলেই আযীযিয়া। আর টিনশেডে না ঢুকে সামান্য আগে বাড়লেই বিন দাউদ।

যারা হাঁটতে পারে তাদের জন্য মিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার সহজ উপায় হলো, টিনশেড টানেলের পথে পায়ে হেঁটে যাওয়া। কেননা, গাড়িতে উঠার আগে ও গাড়ি থেকে নেমে বাসায় পৌঁছতে যতটুকু হাঁটতে হয়, টিনশেডের পথে আনুমানিক ততোটুকু হাঁটলেই মক্কায় পৌঁছে যাবে। তাছাড়া গাড়ির পথে প্রচণ্ড ভিড় থাকায় মিনা থেকে মক্কায় যেতে প্রায় ২-৩ ঘণ্টা লেগে যায়, যা খুবই বিরক্তিকর ও কষ্টকর। তাছাড়া সাধারণ ভাড়ার (১০/১৫ রিয়াল) চেয়ে এ সময় গাড়ির ভাড়াও দশ/বিশ গুণ (২০০/২৫০ রিয়াল) বেশি থাকে। তাই সক্ষম হাজীদের হেঁটে যাওয়াই ভালো। তবে কখনো উভয় দিকে টানেলের মুখে প্রচণ্ড ভিড় দেখা গেলে জানের হেফাজতের জন্য টানেলে প্রবেশের ঝুঁকি নিবে না। যেমন: ১২ তারিখে যোহরের পর বেশিরভাগ হাজী টানেল দিয়ে মিনা থেকে মক্কায় যায়। সুতরাং ১২ তারিখ যোহর থেকে ইশা পর্যন্ত মক্কার দিক থেকে টানেলে ঢুকতে চেষ্টা করবে না। গাড়িতে মিনায় যাবে। ফেরার পথে আশা করা যায় সহজেই টানেল দিয়ে ফিরতে পারবে।

**রিয়াযুল জান্নাহ প্রসঙ্গ**

মসজিদে নববীর বর্তমান মিম্বরের পূর্বপার্শ্ব থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযার দেয়াল বা জালি পর্যন্ত স্থানকে 'রিয়াযুল জান্নাহ' (জান্নাতের বাগান) বলে। পুরো মসজিদে নববীতে লাল রঙের কার্পেট বিছানো আছে। আর রিয়াযুল জান্নাতে ছাই ও সাদা রঙ মিশ্রিত কার্পেট বিছানো আছে। ঐ কার্পেট দেখেই রিয়াযুল জান্নাত শনাক্ত করতে পারবে। এই স্থানে সবসময় ভিড় থাকে। তবুও সুযোগ মতো ওখানে প্রবেশ করে কমপক্ষে দুই রাকআত নামায পড়ার চেষ্টা করবে।

**'রওযা' যিয়ারত প্রসঙ্গ**

অনেকে সালাম পেশ করার সময় রওযার দেয়ালে একজায়গায় (প্রথম জালির উপর)

ما كان محمد ابا احد من رجالكم

এই আয়াত লেখা দেখে ওখানেই সালাম পেশ করে। অথচ এটা সালাম পেশ করার স্থান নয়। বরং সালাম পেশ করার সঠিক স্থান হলো দ্বিতীয় জালি। দ্বিতীয় জালির ঠিক উপরে রওযার দেয়ালে এই আয়াত লেখা আছে–

ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى...

আর এই আয়াতের নিচে يا خير من دفنت بالقاع اعظمه ... চার লাইনের আরবী কবিতা লেখা আছে। এর নিচে চাকতিতে লেখা আছে هنا السلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم এটা হলো সালাম দেয়ার সঠিক স্থান। এখানে পৌঁছার পর সালাম দিবে। এরপর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে আরেকটি চাকতিতে লেখা আছে–

هنا السلام على ابى بكر الصديق رضى الله عنه এখানে হযরত আবূ বকর রা.-এর প্রতি সালাম পেশ করবে। এরপর কয়েক কদম এগোলে আরেকটি চাকতিতে লেখা আছে–

هنا السلام على عمر الفاروق

এখানে হযরত উমর ফারুক রা.-এর প্রতি সালাম পেশ করবে।

## হজ্জে ঘটে যাওয়া কিছু ভুল

১.যারা 'হজ্জে বদল' করতে যায়, প্রেরণকারী যদি হজ্জে তামাত্তু বা যে কোনো হজ্জের অনুমতি দেয় বা সে অনুমতি নিয়ে নেয়, তাহলে ফাতওয়া হল– যদিও ইফরাদ করা উত্তম, তবে তামাত্তু করাও জায়েয। হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী শফী রহ. ও মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী রহ. এই মত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া বর্তমান যুগের কোনো আলেমের এ ব্যাপারে মতভেদ নেই। (জাওয়াহিরুল ফিকহ : পৃ. ৫০৮-৫১৬, ইমদাদুল আহকাম ২/১৮৬)

২.সাধারণত মাসআলার কিতাবগুলোতে লেখা থাকে যে, মক্কা ভিন্ন শহর আর মিনা ভিন্ন শহর। অতএব দুই শহর মিলিয়ে যদি কেউ পনেরো দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে মুকীম হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুকীম বা মুসাফির হওয়ার মাসআলা পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত হয়; পরিস্থিতি পাল্টে গেলে মাসআলাও পাল্টে যায়। বর্তমান পরিস্থিতি হলো– মক্কা ও মিনা এখন আলাদা আলাদা শহর নয়। উভয় স্থানের জনবসতি লাগাতার মিলেমিশে এক জনবসতিতে পরিণত হয়েছে এবং উভয় স্থানের মাঝে জনবসতিহীন স্থান নেই। এমনকি মিনা ছাড়িয়ে জনবসতি এখন মুযদালিফা, আরাফা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মিনার সমস্ত ব্যবস্থাপনাগত কাজ মক্কার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং জনবসতি মিলে যাওয়া এবং সরকার কর্তৃক ব্যবস্থাপনাগত বিষয়াদি একীভূত করে নেয়ায় মিনা মক্কা শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অথবা কমপক্ষে মিনাকে মক্কা শহরের উপকণ্ঠ বা শহরতলী ধরা হবে।

অতএব ফিকহের পুরনো কিতাবে লিখিত মাসআলা বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ার কারণে কার্যকর থাকবে না। সুতরাং এখন যদি মক্কা-মিনা মিলিয়ে কেউ পনেরো দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে মুকীম গণ্য হবে। মাসআলাটি ভালো করে বুঝে রাখা দরকার। কারণ, অনেক আলিমও বর্তমান পরিস্থিতি না জানার কারণে পুরনো কিতাবের মাসআলা বলে থাকেন।

এই মাসআলার একটা নমুনা আমাদের ঢাকা শহরেই আছে। একটা সময় ছিলো, যখন সফরের উদ্দেশ্যে কেউ ঢাকা ত্যাগ করে বিমানবন্দরে গেলে তাকে মুসাফির বলা হতো। কারণ, তখন ঢাকা আর বিমানবন্দরের মাঝে বেশ ফাঁকা ছিলো, কোনো জনবসতি ছিলো না। আর সরকারও তখন এয়ারপোর্ট-উত্তরা এলাকাকে ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত করেনি। সুতরাং তখন ফতওয়া ছিলো, কেউ সফরের উদ্দেশ্যে এয়ারপোর্টে গেলে মুসাফির গণ্য হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এই ফাঁকা স্থানটি বসতিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় এবং সরকার টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত এলাকাকে ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত করায় এখন ফাতওয়া হলো, কেউ বিদেশ ভ্রমণের জন্য এয়ারপোর্ট গেলে তিনি মুসাফির হবেন না; বরং যতক্ষণ না বিমান মাটি ছেড়ে উপরে উঠে ততক্ষণ মুকীম থাকবেন। এয়ারপোর্টের ব্যাপারে এখন যে মাসআলা প্রযোজ্য হয়, মক্কা-মিনায়ও সেই মাসআলা প্রযোজ্য হবে। কাজেই যেহেতু তারা মুকীম হলেন, তাই তাদের জন্য আরো কয়েকটি মাসআলা মানতে হবে–

(ক) তাদের এখন মক্কা, মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায চার রাকআতই পড়তে হবে। (মুসলিম শরীফ, হা.নং ৬৮৭)

(খ) মিনায় ১২ বা ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকতে হয়।

**(২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

# মুরসি কী কী ভুল করেছিলেন

উবায়দুর রহমান খান নদবী

প্রকৌশল বিজ্ঞানী প্রফেসর ড.হাফেয প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসি (জন্ম ১৯৫১ মৃত্যু ২০১৯) প্রায় শত বছরের ইতিহাসে প্রথম মিশরের জননির্বাচিত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রির পর তিনি দেশে ফিরে বারবার এমপি নির্বাচিত হন। পরে প্রেসিডেন্ট হন।

এতবড় দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি সময় সুযোগে আযান দিতেন। ইমাম হতেন। প্রতিটি নামায মসজিদে গিয়ে পড়তেন। বেতনের বাইরে এক পয়সাও রাষ্ট্র থেকে নিতেন না। সপরিবারে কোথাও গেলে সাধারণ মানুষের যানবাহনে যেতেন। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ব্যবহার করতেন না। কর্মকর্তা, মন্ত্রী, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্টাফদের নিয়ে নিজে খতম তারাবীহ পড়তেন।

আমেরিকা বসবাসের সময় জনাব মুরসি ও তার বেগম প্রতি রাতের শেষ প্রহরে নিকটবর্তী মসজিদে চলে যেতেন। মসজিদের টয়লেট, বাথরুম ও উযূখানা ধুয়ে পরিষ্কার করে এরপর তারা তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আযানের পর লোকজন এলে জামাতে ফজর পড়ে তারা বাসায় ফিরতেন।

প্রেসিডেন্ট হয়ে যখন তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে নামায পড়াতেন। তখন ঈমানী আবেগ ও আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি হতো। তখন নামাযের সময় বেশি আবেগ নিয়ে কান্না করতো যে জেনারেল, সে-ই মুহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং ৬ বছর মৃত্যুকূপে রেখে নীরব মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। প্রকাশ্য রূপ আর নামাযে রোনাজারি দেখে মুরসি ওকে সেনাপ্রধান বানিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করেছিলেন। যে আশঙ্কায় তিনি জেনারেল তানতাভীকে তার দলবলসহ সরিয়ে দিয়েছিলেন, এক ইয়াহুদী মায়ের সন্তান জেনারেল সিসি সে আশঙ্কা শতভাগ বাস্তবায়ন করে দেখালো।

এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের তাড়াহুড়া, যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে নানা মত ও পথের আলেমদের উল্টাপাল্টা ফতওয়া এবং অন্যায় চাপ প্রয়োগও কম দায়ী ছিল না। দীর্ঘ সময় বৈরী পরিস্থিতিতেই নিজেদের রক্ষা করা শক্তিটি সামান্য ভোটের ব্যবধানে ক্ষমতায় গিয়ে নিজেদের সুসংহত না করেই বড় বড় সংস্কারে হাত দেয়। ইসরাইল ও সিরিয়ার জটিল রাজনৈতিক পাঁকে জড়ানোর ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন না করে আবেগের আশ্রয় নেয়। আরবসমাজের চলমান রাজনৈতিক খেলায় বুঝে-শুনে চাল দিতে ব্যর্থ হয়ে কায়েমী স্বার্থবাদের গোপন ছুরিকাঘাতের শিকার হয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুধাবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা, একদেশদর্শী ও ছককাটা ক্যাডার পদ্ধতির আন্দোলন করে গড়ে ওঠা নেতৃত্ব যে জায়গাটিতে সম্প্রতি দুনিয়াজুড়ে মার খেয়ে চলেছে। তাছাড়া ইসলামের প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুদের সব ষড়যন্ত্রও মুরসি সমানতালে মোকাবেলা করার যথেষ্ট সময় সুযোগ পাননি। ছদ্মবেশী শত্রুর বিরুদ্ধে তো সচেতনতা গড়ে তোলার সময়ই তিনি পাননি। দুনিয়ালোভী আলেম, সেক্যুলার ও নাস্তিক শক্তি, ধর্মবিদ্বেষী জনসাধারণ তার পতনে বাইরের ইশারায় চলা সেনাবাহিনীকে সমর্থন দেয়। ইসলামপন্থীদের ওপর নেমে আসে অত্যাচারের স্টিমরোলার। ফাঁসি, হত্যা, গুম, কারাদণ্ড, নারী নির্যাতন, মসজিদে তালা, কোন্ জুলুমটি হচ্ছে না বর্তমান মিশরে?!

কারাগারে থাকাবস্থায় মিসরের সাবেক বৈধ প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী অধ্যাপক ড. হাফেয মুহাম্মদ মুরসি আল-ইসকান্দারী একবার এক জিলদ কুরআন মাজীদ চেয়ে আবেদন করেন। সিসি সরকার তাকে কুরআন দেয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। মুরসি তখন জবাবে বলেন, পাক কালামে মাজীদ তো আরো ৪০ বছর আগে থেকেই আমার বুকে সংরক্ষিত করে নিয়েছি। এখন শুধু আল্লাহর কিতাবটি একবার স্পর্শ করার সাধ জেগেছিল মনে। যাক সে আশা পূরণ হবার ছিল না, হয়নি।

এখন তো মুরসি কালামের মালিকের নৈকট্যশীল হয়েই আশা করা যায় তার সান্নিধ্যে চলে গেছেন। পৃথিবীর ছাপা কুরআনের প্রয়োজনীয়তা তার ফুরিয়ে গেছে। কুরআন বুকে নিয়ে তিনি এখন তার মাওলার সীমানায় সুখে থাকুন, এ-ই কামনা। বিশ্বজুড়ে কুরআনের সৈনিকেরা যেন এ কাহিনী কোনোদিন ভুলে না যান।

আল্লাহর লেখা তকদীর তাকে ক্ষমতার মসনদ থেকে কারাগার এবং সবশেষে ন্যায়ের মহান আদালতে হাজির করেছে। বিশ্বমুসলিম জাগরণের জন্য অনেক জরুরী বার্তা রয়েছে হাফেয মুহাম্মদ মুরসি রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মে। তার সংগ্রাম ও শাহাদাতের তামান্নাদীপ্ত আপোষহীন মরণে। দুনিয়াব্যাপী তার প্রতি সমর্থন ও ভালোবাসার নজিরবিহীন আলোড়নে।

তার ভাষণগুলো শুনুন, জীবনী পড়ুন, গুণগুলো অনুসরণ করুন, ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিন, তার মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আল্লাহ যেন তাকে কবুল করেন, তাকে জান্নাত দান করেন।

# ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো টঙ্গী ইজতিমার ময়দানে অনুষ্ঠিত মাস্তুরাতের জোড়ে মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান

**বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম**

*টঙ্গী ইজতিমার কামিয়াবীর জন্য মাস্তুরাত তথা মহিলাদেরকে বিভিন্ন নেক আমল করে দু'আ করতে বলা হয় এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য ও ইজতিমায় শরীক হয়ে বয়ানগুলো শোনার জন্য ঘরের মাহরাম পুরুষদেরকে তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়। ইজতিমা চলাকালীন ইজতিমার ময়দানে মহিলাদের হাজির হওয়ার ব্যাপারে তাবলীগের মুরুব্বীদের পক্ষ হতে অনুমতি তো নেই-ই, বরং মানা আছে। ১৯৯৪ সালে টঙ্গী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি মাসের ১৫, ১৬, ১৭ তারিখ মোতাবেক শনি, রবি ও সোমবার। পরবর্তী জুমু'আবার ২১শে জানুয়ারি টঙ্গী ইজতিমার ময়দানে বিদেশী মেহমানদের জন্য নির্মিত তাঁবুতে প্রথমবারের মতো সারাদেশের মহিলাদের উদ্দেশে জোড় ও বয়ানের ফায়সালা হয়। মাস্তুরাতের এ জোড়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বয়ান হয়। প্রথম বয়ানটি করেন তৃতীয় হযরতজী মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ.-এর সফরসঙ্গী হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.। বয়ানের সময়: সকাল ০৯:৩০ হতে ১১:১০ পর্যন্ত মোট ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। পরের বয়ানটি ও বয়ান শেষে দু'আ করেন স্বয়ং তৃতীয় হযরতজী মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ.। বয়ানের সময়: সকাল ১১:১১ হতে দুপুর ১২:৩১ পর্যন্ত মোট ১ঘণ্টা ২০ মিনিট। ঢাকা শহরসহ সারাদেশের ৬৪ জেলা হতেই মাস্তুরাত তথা মহিলাদের (মাহরামসহ) হাজির হওয়ার ফায়সালা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! আমি (বয়ানলেখক) আমার ৪ সন্তানসহ তাদের মা'কে নিয়ে জোড়ে হাজির হই এবং কাকরাইলের বিশিষ্ট মুরুব্বী ও আমার খাস মুরুব্বী ইঞ্জিনিয়ার হাজী আব্দুল মুক্বীত সাহেব রহ.-এর নির্দেশে আমার উদ্ভাবিত বিশেষ শর্টহ্যান্ড কায়দায় বয়ান দু'টো কলমবন্দ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। রাবেতার এ সংখ্যায় প্রথম বয়ানটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা দয়ামায়া করে এ লেখাকে কবুল করে আমার নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন, আমার সমস্ত নেক আশা-আকাঙ্ক্ষা সসম্মানে সহজে পূর্ণ করুন এবং আমাকে, আমার স্ত্রী-সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজনসহ সারাবিশ্বের বর্তমান ও কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত উম্মতকে দীনের সহীহ বুঝ দান করুন এবং সহীহভাবে দাওয়াতের মেহনতের সাথে লেগে থেকে সহীহভাবে আমলের তাওফীক দান করে উভয় জগতে সত্যিকার কামিয়াবী নসীব করুন। আমীন।*

---

হামদ ও সালাতের পর নিম্নলিখিত আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করেন–

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

অর্থ: ফেরেশতাগণ যখন তাদের চেহারায় ও পেছন দিকে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবজ করবে, তখন তাদের দশা কী হবে? এটা এজন্য যে, তারা এমন পথ অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহকে নারায করে এবং তারা আল্লাহর সন্তোষ সাধনকে অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মাদ-২৭, ২৮)

এরপর বলেন–

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আরাম-আয়েশের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলেনি, তার মৃত্যুর সময় ফেরেশতা নযরে আসবে। ফেরেশতারা তাকে বড় নির্দয়ভাবে পিটাই করবে। তিলাওয়াতকৃত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে। ফেরেশতারা যখন তার রূহ কবজ করবে তার চেহারায় ও পিঠে আঘাত করবে, কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এ সময় সে বুঝবে, দুনিয়া আসলে নিছক স্বপ্নই ছিল!

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

অর্থ: দুনিয়াবী জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ-২০)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

অর্থ: মৃত্যু-যন্ত্রণা এক পরম সত্য। (হে মানুষ!) এটাই সে জিনিস যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে। (সূরা ক্বাফ-১৯)

আল্লাহ তা'আলা মওতকে হাকীকত বলেছেন, পরম সত্য বলেছেন, আর দুনিয়াকে ধোঁকা বলেছেন। হাকীকত যখন সামনে চলে আসে তখন ধোঁকা কেটে যায়!

যেমন অনেকে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে খুব আরাম-আয়েশ করতে থাকে। যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, বুঝতে পারে– সে আসলে স্বপ্ন দেখছিল, অবাস্তব জিনিসে মগ্ন ছিল, ধোঁকার ঘোরে পড়ে ছিল। এমনিভাবে মওতের পর বোঝা যাবে যে, দুনিয়ার জীবন আসলে ধোঁকার জীবন ছিল। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, এই ধোঁকাটা যেন আমরা দুনিয়ায় থাকতেই উপলব্ধি করতে পারি, যাতে প্রস্তুতি নেয়া যায়।

এটা কীভাবে হবে এবং এই উপলব্ধি কীভাবে আসবে? বেশি বেশি ঈমানের আলোচনা করতে হবে, তাহলে দুনিয়ার ধোঁকা বুঝে আসবে। দুনিয়ার ধোঁকা বুঝে আসলে কী হবে? তখন অবস্থা এই হবে যে, যতই কষ্ট হোক, বান্দা আল্লাহকে নারায করবে না এবং যতই আরাম হোক, বান্দা আল্লাহকে নারায করবে না; কষ্টের সময়ও সে আল্লাহর হুকুম পুরা করবে, সুখের সময়ও সে আল্লাহর হুকুম পুরা করবে।

অনেকের ধারণা, দীনের উপর চলতে হলে দুনিয়াদারী পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে। না, দীনের উপর চলতে হলে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে না; বরং দীনদারীর সাথে, আল্লাহর হুকুমের সাথে, নবীর তরীকার সাথে দুনিয়া করতে হবে, তাহলে যেসব কাজকে এখন নিছক দুনিয়াদারী মনে হচ্ছে, সেগুলোই দীনদারীতে পরিণত হবে। তখন বাচ্চাকে লালন-পালন করলে সওয়াব হবে, তাকে দুধ পান করালে সওয়াব হবে। বাচ্চা কাপড়ে পেশাব করে দিলে সওয়াব হবে, তাকে আদর করলে সওয়াব হবে। স্বামীর খিদমত করলে সওয়াব হবে। ঘর-সংসারের কাজে সওয়াব হবে। কিন্তু এর জন্য সবার আগে ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা করতে হবে। নামাযের মধ্যে শক্তি পয়দা করতে হবে। তখন পুরো জীবন শরীয়ত মোতাবেক হবে। ব্যবসার মধ্যে দীন আসবে। আখলাক সুন্দর হবে। ঈমান ও নামাযের শক্তির কারণে ঘর-সংসার, কামাই- রোযগার সবকিছু দীন মোতাবেক হবে। আখলাক উন্নত হবে।

অবশেষে এমন এক পরিবেশ কায়েম হবে, যে পরিবেশে কেউ আসলে তার ভেতর দীনের উপর চলার আগ্রহ ও চাহিদা পয়দা হবে।

এই মজমায় সব রকম বোনেরাই এসেছেন। দাওয়াতের কাজে সময় দেয়া পুরানা বোনেরা এসেছেন, নতুন বোনেরা এসেছেন। শিক্ষিত বোনেরা এসেছেন, অশিক্ষিত বোনেরা এসেছেন। এখন সকলের জন্য কিছু করণীয় জিনিসের কথা বলি–

প্রথমত ঈমানের উপর মেহনত করে ঈমানকে ঠিক করা। এর জন্য–

০১. কালেমার উচ্চারণটা সহীহ করি।

০২. কালেমার অর্থ ও মর্ম নিজ ভাষায় জেনে নেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, (ইবাদাতের উপযুক্ত নেই) এবং হযরত মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল।

০৩. কালেমা পড়ার অন্তর্নিহিত মর্ম কী? কালেমা পড়ে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করা হলো যে, আয় আল্লাহ! তোমার হুকুম তোমার নবীর তরীকায় মেনে জীবন যাপন করব। বান্দা যখন কালেমা পড়ে এই ওয়াদা করে, তখন আল্লাহও ওয়াদা করেন যে, ঠিক আছে তুমি যদি তোমার অঙ্গীকারের উপর ঠিক থাকো, অটল থাকো, আমি তোমার দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন স-ব ঠিক করে দেবো।

০৪. আরেকটা কাজ হলো, ইয়াকীন বদলানো অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ঠিক করা। আমরা দুনিয়ার জিনিস থেকে হতে দেখি। কালেমা পড়ার পর ইয়াকীন করব যে, না, দুনিয়ার জিনিস থেকে যা কিছু হতে দেখি, এগুলো এদের নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা বলে হয় না; বরং এগুলোর ধর্তা-কর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ চাইলে তবেই এগুলো কাজে আসে, আর তিনি না চাইলে এই সবকিছু নিষ্ফল ও বেকার হয়ে যায়।

এই যে আমরা বিভিন্ন হালত ও অবস্থার সম্মুখীন হই, এগুলো আল্লাহই পয়দা করেন। তিনিই হালতকে বিগড়ে দেন, আবার তিনিই শুধরে দেন। জীবন বনা ও বিগড়ানো স-ব আল্লাহর হাতে। প্রশান্তি ও পেরেশানী স-ব আল্লাহর হাতে। হায়াত ও মওত স-ব আল্লাহর হাতে। এভাবে আল্লাহর বড়ত্বের কথা যত বেশি বলতে থাকব, আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন আসতে থাকবে।

০৫. আরেকটি কাজ হলো, মাখলুকের ইয়াকীন দিল থেকে বের করা। সোনা-চান্দি, টাকা-পয়সার ইয়াকীন দিল থেকে বের করা। দুনিয়া, দুনিয়ার ধন-দৌলত, টাকা পয়সা সবকিছুই ছেড়ে যেতে হবে। এজন্য এগুলোর ইয়াকীন দিল থেকে বের করা। প্রয়োজনের সময় জায়েয পন্থায় এগুলো ব্যবহার তো করবো, কিন্তু এগুলোর উপর ইয়াকীন রাখা যাবে না; ইয়াকীন থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পাক যাতের উপর।

মাখলুকের ইয়াকীন দিল থেকে কখন বের হবে? যখন কুরবানী করব। নামায পড়তে কুরবানী করতে হবে। যিকির করতে কুরবানী করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত করতে কুরবানী করতে হবে। তা'লীম করতে কুরবানী করতে হবে। পুরুষদেরকে খোশামোদ করে, খাতির-তোয়াজ করে দীনের কাজে লাগানোর জন্যও কুরবানী করতে হবে। মা-বোনেরা পরামর্শ করে মাহরাম পুরুষের সাথে কিছু কিছু সময়ের জন্য বের হবেন– এতেও কুরবানী হবে, কষ্ট হবে। ঘর-সংসার গুছিয়ে দাওয়াতের কাজে বের হওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য কাজ। তো এসব কুরবানী ও কষ্ট দ্বারা দুনিয়ার ইয়াকীন দিল থেকে বের হয়। এর দ্বারা অনেকের তো জীবনই পাল্টে যায়। আল্লাহর হুকুম নবীর হুকুম ছুটতে দেখলে দিলে উম্মতের দরদ পয়দা হয়। শেষ রাতে উঠে কান্নাকাটি করে। মোটকথা, যিকির, তিলাওয়াত, তা'লীম, পুরুষদেরকে খোশামোদ, নিজে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া– এসব কাজে যে কষ্ট ও কুরবানী হবে, এর দ্বারা মাখলুকের ইয়াকীন দিল থেকে বের হবে। তবে এই কুরবানী ও কষ্ট করতে হবে শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে। ঘর-সংসারও সামলাতে হবে, বাচ্চাদেরও দেখভাল করতে হবে, স্বামীর খিদমতও করতে হবে।

এই উম্মত উজূদে (অস্তিত্বে) এসেছে তিন শ্রেণীর কুরবানী দ্বারা।

০১. পুরুষের কুরবানী অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কুরবানী দ্বারা।

০২. মহিলার কুরবানী অর্থাৎ হযরত হাজেরা আলাইহাস সালামের কুরবানী দ্বারা।

০৩. বাচ্চার কুরবানী অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কুরবানী দ্বারা।

পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চা এই তিন শ্রেণীর কুরবানীর বদৌলতে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ শরীফ আবাদ হয়। বাইতুল্লাহ শরীফ আবাদের পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এক যবরদস্ত দু'আ করেন। এই উম্মতে মুহাম্মাদী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সেই দু'আর ফল-ফসল। এই দু'আর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল করে প্রেরণ করেন। অতঃপর পুনরায় এই উম্মত গঠিত হয় তিন শ্রেণীর কুরবানীর দ্বারা। সর্বপ্রথম যারা নবীজীর দাওয়াতে লাব্বাইক বলে সাড়া দেন তারা–

০১. একজন মহিলা অর্থাৎ হযরত খাদিজা রা.।

০২. একজন পুরুষ অর্থাৎ হযরত আবূ বকর রা.।

০৩. একজন কমবয়স্ক ছেলে অর্থাৎ হযরত আলী রা.।

এভাবে আজও পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চা সবাই মিলে মেহনত করলে পুরো দীন যিন্দা হয়ে যাবে।

আল্লাহ এই কাজ শুধু পুরুষদের দায়িত্বে রাখেননি। মহিলাদেরকেও এই কাজে অংশীদার করেছেন। তবে উভয়ের কাজের তরয ও তরীকা ভিন্ন হবে।

পবিত্র কুরআনে কোন কাজে সচরাচর মহিলাদেরকে আলাদা করে সম্বোধন করা হয়নি; কোন ব্যাপারে সাধারণত পুরুষদেরকে সম্বোধন করে মহিলাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। কিন্তু দাওয়াতের কাজের বেলায় মহিলাদেরকেও আলাদাভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(অর্থ:) মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণ পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা ভাল কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা কথা মানে। (সূরা তাওবা-৭১)

তো যে সকল পুরুষ ও যে সকল মহিলা এই কাজ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা হলো–

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: আল্লাহ এদের প্রতি নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। (সূরা তাওবা-৭১)

এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। কেননা, নিজ ওয়াদা পুরা করতে আল্লাহর কোন বাধা নেই। আল্লাহ তার ওয়াদা পুরা করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। আর কেনইবা রাখবেন

না? তিনি তো সেই পাক যাত, যিনি আসমান পয়দা করেন, যমীন পয়দা করেন, সূর্য পয়দা করেন, চাঁদ পয়দা করেন, মায়ের পেটে তিন অন্ধকারে বাচ্চা পয়দা করেন। আবার তাঁরই এক হুকুমে হযরত ইসরাফীল আলাইহিস শিঙ্গায় ফুঁক দিলে গোটা বিশ্বজগৎ মিসমার হয়ে যাবে; আবাদ পৃথিবী বিরান হয়ে যাবে।

তারপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

অর্থ: আজ রাজত্ব কার? (সূরা মুমিন-১৬)

স-ব নীরব। কারো সাধ্য নেই জবাব দেয়ার। আল্লাহ নিজেই জবাব দিবেন–

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থ: কেবল আল্লাহর, যিনি এক পরাক্রমশালী।

জ্বী, জবরদস্ত এক আল্লাহ-ই রাজত্বের মালিক। তারপর আল্লাহ আরেক হুকুম দিবেন। সবাই যিন্দা হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

আল্লাহ পাঁচটি প্রশ্ন করবেন:

১. জীবন কীভাবে কাটিয়েছো?

২. যৌবন কোথায় লুটিয়েছো?

৩. মাল কীভাবে কামিয়েছো? এবং

৪. কোন খাতে খরচ করেছো?

৫. ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছো?

এ প্রশ্নগুলোর জবাব না দিয়ে কেয়ামতের দিন কেউ কদম উঠাতে পারবে না। তখন বড় ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হবে। এজন্য এসব কথা বেশি বেশি আলোচনা করা। যেহেতু মওত সামনে, কবর সামনে, হিসাব-নিকাশ সামনে, কাজেই আলোচনা করলে এসব ব্যাপারে চিন্তা বাড়বে। তৈরি হওয়া সহজ হবে। দাওয়াতের কাজ করলে আল্লাহ মদদ করবেন, গায়বী নেযাম দ্বারা সাহায্য করবেন। আর কাজ করতে হবে সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায়, গরীব অবস্থায়, ধনী অবস্থায়। তাহলে আল্লাহ দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন, কবরেও করবেন। হাশরেও করবেন।

**আমি কুরআনের কথা বলছি,**

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে এবং সন্তান-সন্ততিগণ (ঈমানের ক্ষেত্রে) তাঁদের অনুগামী হয়েছে, (অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিগণও ঈমান আনে) আমি সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেবো এবং তাদের কর্ম হতে কিছুমাত্র হ্রাস করব না।... (সূরা তূর-২১)

অর্থাৎ, নেককারদের সন্তান-সন্ততি যদি মুমিন হয়, তাহলে আমল দিয়ে তারা পিতা-মাতার মত জান্নাতের উচ্চ স্তর লাভ করতে না পারলেও আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে খুশী করার জন্য সন্তানদেরকেও সেই স্তরে পৌঁছে দিবেন; পিতা-মাতার স্তর কমিয়ে তাদেরকে সন্তানদের সঙ্গে যুক্ত করা হবে না।

অনুরূপভাবে যদি স্বামী উঁচু স্তরের জান্নাত পায়, আর স্ত্রী নিচু স্তরের জান্নাত পায়, আল্লাহ স্ত্রীকে সেই উঁচু স্তরে পৌঁছে দিবেন। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি উঁচু স্তরের জান্নাত পায়, আর স্বামী নিচু স্তরের জান্নাত পায়, আল্লাহ ঐ স্বামীকে সেই উঁচু স্তরে পৌঁছে দিবেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

একজন মহিলা সাধারণত চারজন পুরুষের মধ্যে জীবন যাপন করে। অনুরূপভাবে একজন পুরুষও চারজন মহিলার মধ্যে জীবন যাপন করে। এরা যদি একে অন্যের পেছনে দীনের মেহনত করে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতে তাদেরকে একস্থানে পৌঁছে দিবেন।

**কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ**

১. ঈমানের জন্য মেহনত করা। যত বেশি ঈমানের আলোচনা করব, ঈমান বাড়বে।

২. সিদ্ধান্ত নেয়া যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশ্যই পড়ব। তবে শিখে পড়ব, নবীর তরীকায় পড়ব।

৩. ঘরে ফাযায়েলের কিতাবের তা'লীম করব। এতে আমলের প্রতি শওক ও আগ্রহ পয়দা হবে। মাসআলা-মাসাইল জানার প্রয়োজন হলে মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে জেনে নেবো। আর মাহরাম পুরুষগণ নিজেরা না জানলে উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে এসে বলে দিবেন।

৪. ঘরে ঈমানের আলোচনা করলে আসমানে আমাদের নিয়ে আলোচনা হবে।

৫. সকালে ও সন্ধ্যায় তিন তাসবীহ আদায় করা। তিন তাসবীহ এই–

(এক) সুবহানাল্লাহি, ওয়াল-হামদুলিল্লাহি, ওয়ালা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল আলিয়্যিল আযীম– সকালে ও বিকেলে ১০০ বার করে পড়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যত জায়গায় সূর্যের আলো পড়ে, একবার এই তাসবীহগুলো পড়া তার চেয়ে বেশি প্রিয়।

(দুই) যে কোন সহীহ দুরূদ শরীফ সকালে ও বিকালে ১০০ বার করে পড়া।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একবার দুরূদ শরীফ পড়লে পাঠকারীর প্রতি দশটি রহমত নাযিল হয়।

(তিন) ১০০ বার ইস্তিগফার করা। ইস্তিগফার করা মানে আল্লাহর কাছে নিজ গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া। ইস্তিগফার হিসেবে এই দু'আটিও পড়া যায়–

استغفر الله الذى لا اله الا هوالحى القيوم واتوب اليه.

ইস্তিগফার করলে আল্লাহ রহমত নাযিল করেন এবং বরকত দান করেন। ইস্তিগফার খুব ধ্যানের সাথে করা, যাতে সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৬. প্রতিদিন কিছু পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা। যারা শুদ্ধ করে পড়তে শিখিনি, শিখে নেবো। কুরআনে কারীমের যতটুকু অংশ বা যে কয়টি সূরা নামাযে পড়া হয় ততটুকু তো অবশ্যই সহীহ-শুদ্ধ করা চাই।

৭. আল্লাহর দরবারে যে কোন ভাষায় দু'আর ইহতিমাম করা।

৮. বাচ্চারা যাতে দীন শিখতে পারে, দীন বুঝতে পারে–এর জন্য বাচ্চাদের দীনী তরবিয়ত করা মায়ের যিম্মাদারী। মা তার বাচ্চাদেরকে নামায পড়ে পড়ে দেখাবে।

বাচ্চা সৃষ্টি তো হয় মায়ের পেটে কিন্তু বাচ্চার তরবিয়ত অর্থাৎ দীনী শিক্ষা-দীক্ষা ও দীনের সহীহ বুঝ তৈরি হয় মায়ের কোলে।

**স্মৃতিচারণ**

আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। ছোটবেলায় মাকে নামায পড়তে দেখেছি। আমাকে আমার মা-ই নামায শিখিয়েছেন।

মা বলতেন, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল দেখতে সব একই রকম–বেশকম তো নেই; তবে বেশকম হল নিয়তে।

ঘুমানোর সময় আমার মা আমাকে সূরা বুরুজের কিসসা শোনাতেন। আমি তখন বোম্বে স্কুলে পড়ি। একবার ছুটিতে বাড়ি গেলাম। মা বললেন, আমার দিলে চায়, তুই দীনের ইলম শিখ, কুরআনের ইলম শিখ, যাতে

কিয়ামতের দিন আমার সম্মানের তাজ নসীব হয়!

আত্মীয়রা বললেন, ছেলেটার বাপ নাই, স্কুলে পড়াশোনা করলে হাজার হাজার টাকা কামাই করবে। পক্ষান্তরে মৌলবী হলে ৬০/৭০ রূপির বেশি কামাই করতে পারবে না! মা বললেন, যে দীন শিখবে, শিখাবে দুনিয়া তার পায়ের কাছে এসে ঠোকর মারবে! আমি ভাবতাম, এত বড় দুনিয়া, এ তো আর 'ফুটবল' না! এটা আবার কীভাবে পায়ে এসে ঠোকর মারবে?! আমার মা আমার চিন্তা-ভাবনা গঠন করার নিয়তে রাতের বেলা সময় করে আমাকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ঘটনা পড়ে শুনাতে বলতেন। আমার দীনী তরবিয়তের জন্যই তিনি এটা করতেন। আর রাতে কেঁদে কেঁদে আমার জন্য দু'আ করতেন।

হ্যাঁ, সন্তানের যেন দীনী যিন্দেগী গঠন হয়, এর জন্য মা-বাবার খুউব দু'আ করা দরকার। কারণ, সন্তানের জন্য মা-বাবার দু'আ খুউব কবুল হয়।

একদিন রাতের বেলা– যখন মিটিমিটি আলোয় আমি দীনের কথা পড়ছিলাম– মা আমার জন্য দু'আ করলেন, 'তোমার কথা শোনার জন্য যেন লাখো মজমা হয়।'

জ্বী, আজ আমার কথা শোনার জন্য এই যে লাখো লোকের মজমা–এটা আমার মায়ের দু'আর ফল।

৯. মুজাহাদা ও কষ্টকর জীবন যাপন করা। জীবনে যত সাদেগী হবে, জীবন যত সহজ-সরল হবে, দীনের কাজ করা তত সহজ হবে, টাকা-পয়সা বাঁচবে। বেঁচে যাওয়া টাকা-পয়সা দীনের কাজে লাগানো যাবে। এজন্য কাপড়-চোপর, খানা পিনা সাদাসিধাভাবে করা।

১০. মহিলারা একত্রিত হয়ে বাজে কথা না বলে একে অন্যের সাথে দীনের কথা বলা।

১১. উল্লিখিত সকল কাজে ইখলাস থাকা চাই। একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে সকল কাজ করা চাই।

১২. ঘরের পুরুষদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে বাধা না দেয়া; বরং উৎসাহ দেয়া।

বোনেরা যারা এখানে বসে আছেন, বয়ানের পর নিজেদের মধ্যে তাশকীল করা যে, কে আছেন তাদের পুরুষকে জামাআতে পাঠাবেন? তবে জোর-জবরদস্তি না করা; বরং যেহেন বানানো।

এক ব্যক্তি ঘটনা শুনিয়েছে যে, তার বিবি তাকে তাশকীল করে জামাআতে পাঠিয়েছে। একদিন বিবি তাকে চারমাসের জন্য জামাআতে যেতে বলে। সে রাজী না হওয়ায় বিবি রাগ করে। লোকটা টাকা না থাকার বাহানা দেয়। বিবি বলে, ঠিক আছে আমার কাছে এই ১০০/- টাকা আছে, এটা নিয়েই জামাআতে চলে যান। জামাআতে যাওয়ার পর বিবি অন্য মেয়েদের কাপড় সেলাই করে ২০০/- টাকা উপার্জন করে স্বামীকে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে তার তিনচিল্লা পুরা হয়। তো এভাবে হেকমতের সাথে, কৌশল করে করে পুরুষদেরকে দীন শিখতে জামাআতে পাঠানো।

এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য কিছুতেই এটা নয় যে, মহিলার খরচে পুরুষলোক আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগাবে। বরং পুরুষের জামাআত চলাকালীন বাড়িতে থাকা মহিলার খরচও পুরুষের যিম্মায়। মহিলারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে যে পুরুষরা জামাআতে বের হতে পারে, এটা শুধু তার উদাহরণ হিসেবে বলা হল।

বোম্বেতে এক মহিলা ডাক্তার দাওয়াতের কাজে লাগল। আগে সে কুর্তা উড়িয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে চলাফেরা করতো। দাওয়াতের কাজে লাগার পর চেম্বারে সাইনবোর্ড টানিয়ে দিল যে, এখানে শুধু মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা করা হয়।

তো মানুষ যখন নিয়ত করে তখন আল্লাহ তা'আলা দুই-এর উপর চার-এর ব্যবস্থা করে দেন। আমি দু'আ করি, আপনাদের দ্বারা সারা দুনিয়ায় কাজ হোক। তবে পুরুষের সাথে মাশোয়ারা মাফিক বের হওয়া।

ভাই-বোনদেরকে সম্মিলিতভাবে একটা কথা বলি–

দীনের জন্য মেহনত ও কষ্ট করাকে আল্লাহ তা'আলা বড় মহব্বত করেন, বড় ভালোবাসেন। যে কেউ দীনের জন্য কষ্ট করে, সে আল্লাহর মাহবুব (প্রিয়ভাজন) হয়ে যায়। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা দীনের জন্য তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কষ্ট করান।

একটু আগে খানা-পিনা ও কাপড়-চোপড়ের ক্ষেত্রে যে সাদাসিধাভাব অবলম্বন করতে বলেছি, যেন খরচ বেঁচে যায় এবং বেঁচে যাওয়া অর্থ দীনের কাজে লাগানো যায়– এটা ধীরে ধীরে করি, খরচ আস্তে-ধীরে কমাই, একসাথে তাড়াহুড়ো করে না করি। এতে একটু কষ্ট হবে বটে, কিন্তু আল্লাহর কাছে বড়ই পছন্দনীয় হবে। তবে এর জন্য ঝগড়া-ঝাটিও না করি।

দীনের খাতিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় কষ্ট করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতে বের হতেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দিতেন। কেউ ঠাট্টা করে থুথু দিত, কেউ ধূলা-বালু নিক্ষেপ করতো। তিনি এক একজনকে বুঝাতেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত মলিন চেহারায় ঘরে ফিরতেন। হযরত ফাতেমা রা. পানি দিয়ে নবীজী মুখমণ্ডল ধুয়ে দিতেন এবং পিতার এ অবস্থা দেখে কাঁদতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিতেন যে, বেটি! এ অবস্থা সব সময় থাকবে না। একসময় এমন হবে যে, দুনিয়াতে কোন কাঁচা ঘর বা পাকা ঘর বাকি থাকবে না, যেখানে এই দীন পৌঁছবে না অর্থাৎ প্রতিটি ঘরেই দীন পৌঁছে যাবে, প্রতিটি ঘরওয়ালারই দীন কবুল করবে।...

এসব ঘটনা এজন্য শোনাচ্ছি যে, দীনের কাজে কষ্ট করা হলে তা কখনও বেকার যায় না, এর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যায়। দীনের জন্য কুরবানী করলে জান্নাতে আল্লাহ বলবেন, আরও চাও। বান্দা চাইবে, আল্লাহ দিতে থাকবেন। এভাবে বারবার বলায় জান্নাতী বলবে, আয় আল্লাহ! আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, দীনের জন্য কুরবান হবো। আল্লাহ বলবেন, আর নয়, দীনের জন্য কুরবান হওয়ার সুযোগ তো দুনিয়ায় ছিল।

উসূল: দাওয়াতের মেহনতে মহিলাদের সকল কাজ পুরুষদের মাশোয়ারা সাপেক্ষে হবে।

*[বি.দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারাত-হাওয়ালাহ অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাসকারী- অত্র জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শা'বান-২০০২, ২০১২ ও ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ান লেখকের মেজো সাহেবযাদা)]*

**আত্মজীবনী**

*দারুল উলূম করাচীর মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে অনুবাদ করছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী, বর্তমানে দারুল উলূম করাচীর ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী**।*

# ইয়াদেঁ - یادیں

## শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

**(সপ্তম পর্ব - ساتویں قسط)**

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যা কিছু রাষ্ট্রীয় সরঞ্জামাদি পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিলো, প্রথমত তা ন্যায্য পাওনা থেকে কম ছিলো। তাছাড়া পাকিস্তানের মালিকানাধীন অনেক সরঞ্জাম হিন্দুস্তানেই রয়ে গিয়েছিল। এগুলো ফিরে পেতে দীর্ঘদিন ধরে মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। ফলে পাকিস্তানকে যৎসামান্য সরঞ্জামাদি নিয়েই পথচলা শুরু করতে হয়েছিলো। সে সময় পাকিস্তানের রাজধানী ছিলো করাচী। মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারিগণ টিনের ঘরে অফিস করতেন। পেপারওয়েটের বদলে পাথর ব্যবহার করতেন। কাগজ জোড়া দেয়ার জন্য পিনের বদলে গাছের কাঁটা ব্যবহার করতেন। সে সময় পাকিস্তান সংসদের সংবিধান প্রণেতারা 'বোর্ড অব তা'লীমাতে ইসলামিয়া' নামে একটি বোর্ড গঠন করে দিলেন এবং তার অফিসের জন্য সংসদের পাশে একটি ঝুপড়ি বানিয়ে দেয়া হলো। বোর্ডের সভাপতিত্বের জন্য আল্লামা সায়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ.-কে আহ্বান করা হয়েছিলো। হযরত আব্বাজানকেও কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়েছিল। এই বোর্ডের কাজ ছিলো, প্রণীত সংবিধানে ইসলামী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা। সে সূত্রে আব্বাজান রহ.-কে 'জ্যাকব লাইনে' ভাড়ায় একটি কোয়ার্টার দেয়া হয়েছিলো। ওদিকে সে সময় আমাদের সবার বড়বোন মরহুমা নাঈমা খাতুন স্বীয় স্বামী ও সন্তানাদিসহ হিন্দুস্তান থেকে করাচী চলে এসেছিলেন। সুতরাং আব্বাজান রহ. প্রায় একবছর অবধি কিংস কোর্টে থাকার পর সেই ফ্ল্যাটটি সাময়িকভাবে বড় আপাকে দিয়ে তিনি জ্যাকব লাইনের কোয়ার্টারে চলে এলেন।

আগে বলে এসেছি, জ্যাকব লাইনের মাদরাসাটি হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবী রহ. প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানে আমার বড়ভাই আগে থেকেই পড়াশোনা করে আসছিলেন। এখন সেটা আমাদের নতুন বাসা থেকে কাছে হয়ে গেলো। এবার আমাকে এতটুকু বড় বলে স্বীকৃতি দেয়া হল যে, আমি এখন জ্যাকব লাইনের মাদরাসায় পড়াশোনার উপযুক্ত। কিন্তু হযরত আব্বাজান রহ. সম্ভবত আমার শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার প্রতি লক্ষ করে আমার অন্যান্য চার ভাইয়ের বিপরীতে আমাকে হিফয পড়াননি; সরাসরি উর্দূ, ফার্সির বুনিয়াদী কিতাব শুরু করিয়ে দিয়েছেন। এর সূচনা ছিল 'হামদে বারী' দিয়ে। 'হামদে বারী' মাওলানা মরহুম আব্দুস সামী' বে-দিল রহ. বিরচিত কিতাব। এই কিতাবে বিভিন্ন শব্দের অর্থ 'মসনবী'র শে'রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যদিও মাওলানা আব্দুস সামী' সাহেব রহ. বেরেলভী মতাদর্শের ছিলেন, কিন্তু তার এই কিতাব শিশুদেরকে শব্দার্থ মুখস্থ করানোর জন্য উপকারী বলে মনে করা হতো। এজন্য উলামায়ে দেওবন্দ এই কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে লেখকের মতাদর্শকে প্রতিবন্ধক মনে করেননি এবং কিতাবটি প্রায় সকল মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছিলো। আমি সেটি এবং ফার্সি গর্দানের কিতাব 'রিসালাহ নাদের' হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব রহ.-এর কাছে জ্যাকব লাইনের মাদরাসায় পড়তে শুরু করলাম। রিসালাহ নাদের-এর লেখক ছিলেন আমাদের দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন রহ.। কিন্তু আমার বয়সস্বল্পতার দরুন এই পড়াশোনা নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। ইচ্ছে হলে সবক পড়তাম, ইচ্ছে হলে ছুটি কাটাতাম। আবার কোন সবক এক উস্তায থেকে পড়ে নিতাম, তো অন্য সবক অন্য উস্তায থেকে। হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব থানবী রহ.-এর সন্তানদের মধ্যে মাওলানা ইহতিরামুল হক সাহেব আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন। আর জনাব ই'তিসামুল হক সাহেব হাফিযাহুল্লাহ ছিলেন আমার প্রায় সমবয়সী। অনিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার বাইরের সময়গুলো আমার বেশিরভাগ তাদের সাথেই কেটে যেতো। আবার কখনো হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব থানবী রহ.-এর বাসায় অনুষ্ঠিত মজলিসে বসতাম। এই অনিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার একটা কারণ এ-ও ছিলো যে, সে সময় আমার বেশ কয়েকবার টাইফয়েড হয়েছিলো। এর ফলে মাসের পর মাস আমার বিছানায় কেটে যেতো।

অপরদিকে সে সময় আমাদের ভাইজান (জনাব মুহাম্মদ যাকী কাইফী রহ.) স্থায়ীভাবে লাহোর চলে গেলেন। সেখানে তিনি ইদারায়ে ইসলামিয়া নামে একটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করলেন। এ সময় তার স্ত্রী– আমাদের ভাবী সাহেবা –সন্তানসম্ভবা ছিলেন। সময়ও ঘনিয়ে এসেছিল। (জন্মের পর বাচ্চাটির নাম রাখা হয়েছিল মুহাম্মদ মাসঊদ গাওয়াস। এটি ছিল তাদের প্রথম সন্তান এবং জন্মের কিছুদিন পরই তার ইন্তিকাল হয়ে যায়।) এ কারণে আম্মাজান তখন লাহোর সফর করেছেন। আমি তার আহ্লাদী সন্তান হওয়ায় তিনি আমাকে রেখে সফর করতেন না। মুহতারাম ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুম, যাকে আমি ঘরোয়া বে-তাকাল্লুফ পরিবেশে 'ভাই রফী' বলে সম্বোধন করি, এই স্মৃতিচারণেও সংক্ষিপ্ততা ও বে-তাকাল্লুফী করে কখনো এভাবেই সম্বোধন করবো। সে সফরে তিনি মাহরাম হিসেবে আম্মাজানের সফরসঙ্গী হলেন। এ সফরে আম্মাজানের সাথে আমাদেরকে দুইমাস সেখানে থাকতে হয়েছে। ভাই সাহেব যেহেতু তখন কুরআনে কারীম হিফয করছিলেন তাই তিনি জামি'আ আশরাফিয়ার এক উস্তাযের কাছে হিফযের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। কিন্তু আমার পড়াশোনা আগে থেকেই অনিয়মিত ছিলো। তাই আমার পড়াশোনার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতা তালাশের প্রয়োজন ছিলো না। তবে আম্মাজান যখনই কিছুটা অবসর পেতেন, আমাকে বেহেশতী গওহর ও সীরাতে

খাতামুল আম্বিয়া পড়াতে বসে যেতেন। বাকি সময় ঘোরাফেরা, খেলাধুলায় কেটে যেতো। সে সময়ের একটি ঘটনা কখনও ভোলা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড শীতের মওসুম ছিল। অধিকাংশ সন্ধ্যায় ভাই রফী সাহেব, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মতীন খতীব সাহেব রহ.-এর সাহেবযাদা মরহুম মুহাম্মদ মুঈন সাহেবের সাথে ল্যারেন্স গার্ডেনের 'গুলশানে ফাতেমা'য় প্রমোদ ভ্রমণে যেতেন। তখনকার দিনে গার্ডেনটি অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত, সাজানো-গোছানো ও পরিপাটি ছিলো। আমিও কখনো কখনো তাদের সাথে চলে যেতাম। গার্ডেনের মাঝখানে একটি লেক ছিলো। একবারের ঘটনা। তারা উভয়ে খোশগল্পে লিপ্ত ছিলেন। আর আমি লেকের পাড়ে নির্মিত রেলিঙের উপর উঠে হাঁটার অনুশীলন শুরু করে দিলাম। কিছুক্ষণ সফলভাবেই অনুশীলন চললো। হঠাৎ রেলিঙ থেকে পা ফসকে পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। ডিসেম্বরের কনকনে শীতে লেকের পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা ছিলো। চোখের পলকেই যেনো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছিলাম। লেকটি যদিও অতোটা গভীর ছিল না, কিন্তু আমার মতো ছোট্ট বালককে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ভাই রফী সাহেব ও ভাই মুঈন সাহেব আমাকে আধমরা অবস্থায় পানি থেকে টেনে তুললেন। কিন্তু ভেজা কাপড়চোপড়ে পুরো শরীর কাঁপছিলো এবং শীতের তীব্রতায় দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি চলছিলো। কাপড় পরিবর্তন করার মত কোন ব্যবস্থাও ছিল না। ভাই রফী সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুম তখন শেরওয়ানী পরে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দিন! তিনি নিজের শেরওয়ানী খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। কে জানে, কিভাবে তারা আমাকে বাসায় এনে আগুনের সেঁক দিয়েছেন! এরপর আমার প্রাণে প্রাণ ফিরেছে! এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো সেই সবক তো আমি সেদিনই পেয়ে গিয়েছিলাম যে,

من رعي حول الحمي اوشك ان يقع فيه

'যে ব্যক্তি সীমানা ঘেঁষে বিচরণ করে, প্রবল আশঙ্কা, শীঘ্রই সে নিষিদ্ধ সীমায় পতিত হবে।'

কিন্তু হায়! যদি নিজের আমল-আখলাকেও এই শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারতাম!

ভাই রফী সাহেব সে সময় 'নীলা গুম্বাদ'স্থ জামি'আ আশরাফিয়া লাহোরের পুরাতন ভবনের একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ফ্ল্যাটে থাকতেন। সেই ফ্ল্যাটের ঠিক উপরের তলায় হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী রহ. এবং সবার উপরের তলায় জামি'আ আশরাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব রহ. থাকতেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর বিশেষ খুলাফাদের একজন ছিলেন। জামি'আ আশরাফিয়া মাদরাসাটি তিনি মূলত অমৃতসরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পূর্বপাঞ্জাবে যখন মুসলিম গণহত্যা শুরু হয়, তখন তিনি লাহোর চলে আসেন এবং এখানে জামি'আ আশরাফিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ.-এর তরফ থেকে আমাদের প্রতি জোর তাগিদ ছিল, কোন প্রয়োজনে যখনই লাহোর যাবে অবশ্যই হযরতের খেদমতে হাজির হবে। সে সময় আমার বয়স ছিল সবেমাত্র সাতবছর। ভাইজানের সাথে হযরতের খেদমতে আমার বারবার হাজির হওয়া এবং তার অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা ও দু'আয় সিক্ত হওয়ার কথা আজও খুব মনে পড়ে। হযরতের উচ্চ মাকাম সম্পর্কে আমার তখন কীইবা ধারণা ছিলো এবং বস্তুত আজও নেই! কিন্তু তখনকার সেই অনুভূতি আজও স্মৃতিতে অম্লান। হযরতের মজলিসে গিয়ে সেই সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠুরিতেও এক বিস্ময়কর ঝলক ও পুলক অনুভব হতো। মনে হতো, আমরা বুঝি পরম স্নেহ ও মমতার শামিয়ানায় অবস্থান করছি! আল্লাহ তা'আলা হযরতকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন!

এ সময় ভাইজান একদিন দোকান থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরে বললেন, শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. ইন্তিকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন! তাঁর ইলমী মাকাম ও উৎকর্ষ সম্পর্কে সেই বালক বয়সে আমার কীইবা ধারণা ছিলো! কিন্তু তাঁর শফকত ও স্নেহ থেকে মাহরূম ও বঞ্চিত হওয়ার কথা ভেবে ভেবে আমার অবুঝ মন আকুল হয়ে উঠেছিলো। পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম, তাঁর ইন্তিকাল এই দেশ ও জাতির জন্য কতটা দুঃসংবাদ ছিল। তাঁর ইন্তিকাল ছিল দীনী সমাজের জন্য এক অপূরণীয় সংকট। বিচিত্র চেতনা ও মাসলাকের সকলকে তিনি একসুতোয় গেঁথে রেখেছিলেন।

আমাদের দ্বিতীয় বোন মুহতারামা আতিকা খাতুন মাদ্দাযিল্লাহা। তিনি দেওবন্দেই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী জনাব মরহুম মুন্সী শাব্বীর আহমাদ সাহেব দেওবন্দ থাকাকালীন ইন্তিকাল করেছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের একজন একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন। আপার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর আব্বাজান রহ. তাকে পাকিস্তান নিয়ে এসেছেন। আপাজান তার তিন কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে লাহোরে আসেন। এরপর আমাদের সাথে করাচী পৌঁছেন। আমাদের জ্যাকব লাইনের কোয়ার্টারের একপাশে তিনি থাকতে থাকেন। জ্যাকব লাইনের বাসায় আমরা প্রায় দু'বছর ছিলাম। সে সময়ই আমার বড়বোন মুহতারামা হাসিবা খাতুন রহ.-এর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং রুখসতী হয়ে তিনি শ্বশুর বাড়ি চলে যান।

জ্যাকব লাইনের এই কোয়ার্টার খুবই সাদামাটাভাবে সরকারী কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। এর দেয়ালগুলোও ছিল অস্বাভাবিক নীচু। দেয়াল টপকে ঘরে ঢুঁ মারতে চোরদের বেশি বেগ পেতে হতো না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ বাসায় চোরের খুব উৎপাত ছিল। কিন্তু তখনকার চোরেরাও ছিল 'অপ্রশিক্ষিত'। লোকচক্ষু ফাঁকি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে মামুলি কিছু হাতে পেলেই বিরাট গনীমত মনে করতো। আর যদি কোনভাবে বুঝতে পারতো, ঘরের লোকদের চোখ খুলে গেছে, যেভাবে দেয়াল টপকে এসেছিল সেভাবেই দ্রুত ভেগে যেতো। এভাবে ছোটখাটো চুরি হতেই থাকতো। কিন্তু একবার এমন হলো যে, হযরত আব্বাজান রহ. হজ্জের নিয়ত করলেন। সকল পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে তিনি জাহাযের টিকিট, পাসপোর্ট ইত্যাদি একটি থলের মধ্যে হেফাযত করলেন। খুবসম্ভব সেখানে কিছু বৈদেশিক মুদ্রাও ছিল। রাতে যখন সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন, আল্লাহ মালুম, কিভাবে যেন এক চোর সেটি উঠিয়ে নিয়ে গেল! আগেই বলেছি, থলের ভেতর আব্বাজান রহ.-এর হজ্জের সকল আসবাবপত্র মজুদ ছিল। আব্বাজান রহ. সকালে উঠে দেখলেন সব সামান গায়েব! অর্থকড়ি, টিকিট, পাসপোর্ট কিছুই রেখে যায়নি। এদিকে জাহাজ ছাড়ার সময় এতোটাই নিকটবর্তী

ছিল যে, অর্থের ব্যবস্থা কোনভাবে হয়ে গেলেও পাসপোর্ট-ভিসার সরকারী কার্যক্রম সম্পন্ন করার মত সময় ছিল না। ফলে সে বছর হজ্জের যাবতীয় প্রস্তুতি নেয়া সত্ত্বেও আব্বাজান রহ. হজ্জে যেতে পারেননি। হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব রহ. খুবই কৌতুকামোদী ছিলেন। আব্বাজান রহ. যখন তাঁকে এই ঘটনা শোনালেন, তিনি বললেন– 'হযরত! এখন তো সেই চোরা বেটাই হজ্জ করবে!'

এ ধরণের ঘটনাপ্রবাহে আমরা আব্বাজান রহ.-এর তাকদীরের উপর যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা সবসময় লক্ষ্য করেছি, এর দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

আমাদের যে বোন স্বামীর ইন্তিকালের পর স্বীয় তিনকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান চলে এসেছিলেন তার আসার পর জ্যাকব লাইনের বাসাটি আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। হযরত আব্বাজান রহ. ব্রান্স রোডের সন্নিকটে ক্যাম্বল অ্যাস্টেরয়েডের এক বিল্ডিংয়ে প্রশস্ত একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। সেটি 'ইকবাল মনযিল' নামে খ্যাত ছিল। আমরা সেখানে চলে গেলাম। পাঁচবছর (অর্থাৎ ১৯৫১ ঈসায়ী থেকে ১৯৫৬ ঈসায়ী পর্যন্ত) আমরা ওখানেই ছিলাম। এই পাঁচবছর কয়েকদিক থেকে বেশ বরকতময় ছিল। সে সময়ই করাচী আমাদের স্থায়ী আবাসভূমি হিসেবে নিশ্চিত হয়।

**বাল্যকালে আমার প্রথম হজ্জের সফর**

এই বাসায় স্থানান্তরিত হবার পর বড় একটি নেয়ামত এই ছিলো যে, এখানে এসে হযরত আব্বাজান রহ.-এর হজ্জের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছে। এক বছর পূর্বে জ্যাকব লাইনের কোয়ার্টারে থাকাবস্থায় তিনি হজ্জের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেও তাঁর পাসপোর্ট, টিকিট ইত্যাদি চুরি যাওয়ায় তিনি হজ্জে যেতে পারেননি। এ বছর আব্বাজান ফের দৃঢ় সংকল্প করলেন। এই সফরে আমার আম্মাজান রহ. এবং আমাদের ভাইজান (মুহাম্মাদ যাকী কাইফী সাহেব রহ.)-ও আব্বাজানের সফরসঙ্গী হলেন। আমার বয়স তখন আট বছর। আমি বিহীন আম্মাজানের কোন সফরই যেনো সম্ভব ছিল না! এই সুবাদে সেই ছোট্ট বয়সে আমারও হজ্জের সৌভাগ্য হল। সুতরাং ৩১ জুলাই ১৯৫১ ঈসায়ী সনে আমরা এই মুবারক সফরে রওয়ানা হলাম।

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এক বুযুর্গ আলহাজ্জ যফর আহমাদ সাহেব থানবী রহ. সে সময় 'প্যান ইসলামিক স্টিম শিপ কোম্পানি'র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সে কোম্পানির একটি নৌজাহায ছিলো। সেটাকে 'সাফিনায়ে আরব' বলা হতো। হজ্জের মৌসুমে হাজীদের আনা-নেয়া করতো। এ জাহাযের উপরের তলায় তিনি আমাদের জন্য একটি বড়সড় কেবিন বুক করিয়ে দিয়েছিলেন। কেবিনের একপাশে তিনি তার স্ত্রী, পুত্র মুশাররফ আলী এবং একমাত্র কন্যাকে নিয়ে উঠেছিলেন। অন্যপাশে আব্বাজান রহ.-এর সঙ্গে আমরা ছিলাম। সে বয়সে হজ্জের পবিত্র সফরের সামান্য অনুভূতি তো ছিলোই সেই সাথে জাহাযে আরোহন এবং সফরের মুগ্ধতাও দারুণভাবে জড়িয়ে ছিলো। আলহাজ্জ যফর আহমাদ সাহেবের পুত্র ও কন্যাও আমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন। ফলে লৌকিকতা কাটিয়ে আমাদের বন্ধু হয়ে উঠতে সময় লাগেনি। বিশালাকারের জাহাযটি যেন আমাদের গোল্লাছুটের মাঠ বনে গেল। হৈ-হুল্লোড় শেষে যা সময় বাঁচতো আমি হজ্জের কিতাব থেকে তাওয়াফের দু'আগুলো মুখস্থ করে নিতাম। প্রায় এক সপ্তাহের এই সামুদ্রিক সফর ছিলো যারপরনাই মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক। এটা আমাকে দারুণভাবে বিমোহিত করেছিলো। সফরের একপর্যায়ে আমি আব্বাজান রহ. ও অন্যান্যদেরকে দেখলাম, তারা কাপ্তানের কাছ থেকে ইয়ালামলামের সামনে দিয়ে জাহায কখন অতিক্রম করবে তা মালুম করে নিচ্ছেন। (সে সময় পর্যন্ত তাহকীক এটিই ছিল যে, নৌযান যখন ইয়ালামলামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে তখনই ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। কিন্তু পরবর্তীতে এসে এই তাহকীক বদলে গেছে। এর বিস্তারিত বিবরণ জাওয়াহিরুল ফিকহ নামক কিতাবে রয়েছে।)

সুতরাং যখন জানা গেলো যে, জাহায ইয়ালামলাম পৌঁছে গেছে, সবাই ইহরাম বেঁধে নিলেন। আমাকেও ইহরাম করিয়ে দেয়া হলো। এ সময় গোটা জাহায লাব্বাইকের সুমধুর ধ্বনিতে মুখরিত ছিলো। পরের দিন আমরা জেদ্দা পৌঁছে গেলাম। জেদ্দা তখন একটি ছোট্ট শহর ছিলো। হাজীদের বিশ্রামের জন্য সেখানে একটি 'হুজ্জাজ মনযিল' নির্মাণ করা হয়েছিল। সে মনযিলেই কাঠের তৈরি একটি ছিমছাম কামরায় আমরা অবস্থান করেছিলাম। ওখানকার মাটি এতোটাই ভেজাভেজা ছিলো যে, কামরা থেকে বাইরে কদম ফেললেই জুতোসহ পা মাটিতে দেবে যেতো। হাঁটাচলা ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খাবারের একটিমাত্র দোকান ছিলো। দোকানের রুটিতে লালবর্ণের পোকা কিলবিল করতো (যেটাকে সুরসুরি বলা হতো)। রুটি থেকে পোকা তাড়িয়ে মুখে দিলেও তার দুর্গন্ধের রেশ থেকেই যেতো। তাই সেগুলো না খেয়ে অন্য কোনভাবে ক্ষুধা নিবারণ করতে হতো। পুরো জেদ্দা শহরে পাকা সড়ক ছিলো হাতেগোনা কয়েকটি। বেশিরভাগই ছিলো কাঁচা। মক্কা মুকাররমা যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলে জানতে পারলাম, বাসে আরোহনের জন্য অনেক দূর বাসস্ট্যান্ডে যেতে হবে। স্টেশনে পৌঁছার কয়েক ঘণ্টা পর বাস আসলো। আমরা একটি আধাপাকা সড়ক ধরে মক্কা মুকাররমা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। যতটুকু মনে পড়ছে, মক্কা মুকাররমায় পৌঁছতে আমাদের চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লেগে গেলো। অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত মনযিলের দেখা পেলাম, একসপ্তাহ ধরে যার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে ছিলাম।

ইশার সময় যখন মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলাম, আহা সে দৃশ্যটি কতই না ঈমানজাগানিয়া ছিলো! সেখানে একটি দরজার পাশে গাড়ী থামলো। অনেক মানুষ আবে যমযম হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা সুবাসিত পেয়ালায় যমযম পান করিয়ে তারা মেহমানদের ইস্তিকবাল করছেন। মক্কা মুকাররমার বরকত ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মু'আল্লিমের কাছে আমাদের আসবাবপত্র বুঝিয়ে দেয়া হলো। হজ্জের সময় ছিলো অত্যাসন্ন। আমরা সবাই 'কিরান' হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম। সে রাতেই আব্বাজান রহ. আমাদের সবাইকে নিয়ে হারাম শরীফে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হারাম শরীফে প্রবেশ করতেই নীলরঙের গিলাফে আবৃত বাইতুল্লাহর সেই ঈমানজাগানিয়া দৃশ্য আজও আমার স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করছে। বয়সসল্পতা সত্ত্বেও সেই সৌন্দর্য ও মহিমার মূর্তপ্রতীক দর্শনে আমি হতবাক হয়ে পড়লাম। আমার মনে হচ্ছিলো, এই দৃশ্য আমার চিরচেনা, আমি আগেও যেন তা অবলোকন করেছি। আমার বড়রা অঝোরে কাঁদছিলেন। এই আকুল-ব্যাকুল হালতেই আমাদের তাওয়াফ শুরু হয়ে গেলো। আসার পথে রাস্তায় আমি হজ্জের নিয়ম-কানুন পড়তে পড়তে আসছিলাম। হাজরে আসওয়াদ আর রুকনে ইয়ামানী'র কত অসংখ্য দৃশ্য

কল্পরাজ্যে এঁকে রেখেছিলাম! তাওয়াফের যে সব দু'আ সেই কিতাবে ছিলো, সেগুলোও কিছু কিছু ইয়াদ করে রেখেছিলাম। কিন্তু মনযিলে পৌঁছতেই সব বেমালুম ভুলে গেছি। কিচ্ছুটি না বুঝেই আব্বাজানের পেছন পেছন হেঁটে তাওয়াফ পূর্ণ করলাম।

এবার সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পালা। সে সময় মাস'আ অর্থাৎ সাঈর জায়গাটি আজকালের মতো আলাদা করা ছিল না। বরং সাফা ও মারওয়ার মাঝ দিয়ে একটি উন্মুক্ত সড়ক ছিলো। সড়কের দু'ধারে দোকানপাট ছিলো। সড়কে হকারদের ভ্যানও দাঁড়াতো। গাড়ীও চলাচল করতো। এসব দোকানপাট ও যানবাহনের ফাঁক-ফোকর দিয়েই সাঈ করতে হতো। আব্বাজান রহ. প্রথমে আমাদেরকে তাঁর সাথেই রেখেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, ভিড়ের কারণে বাচ্চাদের পদদলিত হবার অথবা হারিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে, তখন তিনি একটি হাতে ঠেলা গাড়ী ভাড়া নিয়ে আমাদের তিন শিশুকে তাতে বসিয়ে দিলেন। গাড়ীর চালককে গুরুত্বসহকারে বলে দিলেন, সে যেনো আব্বাজানের সাথেই লেগে থাকে। উপরন্তু একটি জায়গাও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সাঈর পর সেখানে গিয়ে মিলিত হওয়া যায়। গাড়ীতে বসার খানিক পরেই কোন এক ভিড়ে আব্বাজান ও ভাইজান রহ. আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। অতঃপর আমরা যখন নিজেদেরকে এমন এক আজনবী লোকের হাতে আবিষ্কার করলাম, যে কিনা আমাদের ভাষা বোঝে না এবং আমরাও তার ভাষা বুঝি না, তখন আমরা আমাদের ধৈর্য-সহ্যের কাছে হেরে গেলাম। ব্যস, তিনওজন মিলে কান্নাকাটি জুড়ে দিলাম। এরপর স্মরণ নেই কিভাবে সাঈ পূর্ণ হলো এবং কিভাবে আমরা আব্বাজানের সাথে মিলিত হলাম।

আব্বাজানের এক বন্ধু মরহুম হাজী দাউদ মাইত সাহেব মক্কা মুকাররমায় মুকীম ছিলেন। তিনি আব্বাজান রহ.-কে বললেন, আমাদের অবস্থান কোন মু'আল্লিমের কাছে না হয়ে যেনো তার বাসায়ই হয়। সে সময়ের হারাম শরীফ দেখেছেন এমন মানুষের সংখ্যা বর্তমানে হাতেগোনা দু'চারজনই আছেন হয়তো। হারাম শরীফ সে সময় শুধুমাত্র (পুরাতন) তুর্কী স্থাপনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো এবং তার চতুর্দিকে একেবারে হারাম শরীফ ঘেঁষে তিনতলা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মিত ছিলো। আজকাল যেখানে বাবুল ফাতহে'র অভ্যন্তরীণ সিঁড়ি রয়েছে তার সন্নিকটেই হারামের একটি ছোট্ট দরজা ছিলো, যেটাকে বাবুর রিবাত বলা হতো। এই বাবুর রিবাতে'র সিঁড়ি বেয়েই ফ্ল্যাটে যেতে হতো। চতুর্থ তলায় হাজী দাউদ মাইত সাহেব রহ.-এর বাসা ছিলো। সেই বাসার যে কামরায় আমাদের অবস্থান ছিলো তার জানালা হারাম শরীফ অভিমুখে খুলতো। সেখান থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ, মীযাবে রহমত এবং হাতীম-এর দৃশ্য কখনোই চোখের আড়াল হতো না।

মিনায় তখন সবেমাত্র যৎসামান্য বসতি গড়ে উঠেছে। হাজী দাউদ মাইত সাহেব মিনায় একটি বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখানেই আমাদের সবার কিয়াম ছিলো। আগামীকাল আরাফাহর দিকে ছুটতে হবে। সে বয়সে মানাসিকে হজ্জ-এর অনুভূতিই বা কী ছিলো? এতোটুকু মনে আছে, দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁবু এবং সবার এক রঙের সফেদ লেবাস আমার কাছে যারপরনাই বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলো। তীব্র গরম সত্ত্বেও সবাই অত্যন্ত আনন্দ ও উৎফুল্লের সাথে তালবিয়া পড়তে পড়তে জাবালে রহমত অভিমুখে ছুটে চলছে। প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিলো। এতদসত্ত্বেও আব্বাজান রহ. জাবালে রহমত পর্যন্ত যাওয়ার মানসে তাঁবু থেকে রওয়ানা হয়েছেন। পরবর্তীতে লোকেরা বললেন, কোনভাবে ওখানে পৌঁছে গেলেও ফের তাঁবু পর্যন্ত ফিরে আসা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ, ইতোমধ্যে তাঁবুগুলো সব খুলে ফেলা হবে। সুতরাং আব্বাজান নিজ তাঁবুতে ফিরে এসে আম্মাজান ও ভাইজানকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত খুশু-খুযুর সাথে উকূফে মশগুল হয়ে গেলেন।

সূর্যাস্তের পর আমরা ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে মুযদালিফায় পৌঁছলাম। মুযদালিফা তখন একটি বালুকাময় মরুপ্রান্তর ছিলো, যেখানে চাঁদের রৌশনী ছাড়া আর কোনো বাড়তি আলো ছিল না। দিনভর প্রখর রোদের পর খোলা আকাশের নিচে শীতল পরিবেশ আল্লাহর এক অপার নেয়ামত ছিলো। সবাই ক্লান্তশ্রান্ত। বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু বিশ্রামের পূর্বে আসবাবপত্র হেফাযত করার প্রয়োজন ছিলো জরুরী। কারণ, তখন সেখানে চোর-ডাকাতদের উৎপাত ছিলো। সে সময় সৌদীর রাজত্বের বাগডোর ছিলো রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর হাতে। সবখানে তখনো নিরাপদ পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। সুতরাং আমাদের বড়রা সিদ্ধান্ত নিলেন, আসবাবপত্র মাঝখানে রেখে তার চারদিকে শোবার ব্যবস্থা করবেন। এমনটাই হলো। ক্লান্তশ্রান্ত সবাই গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, এতো সতর্কতার পরও একটি বাক্স গায়েব! এবং সেই বাক্সেই আমাদের সব আসবাবপত্র ছিলো। ইহরাম খোলার পর পরিধেয় বস্ত্রও ও-ই বাক্সেই ছিলো। তাছাড়া সবার পাসপোর্ট এবং নগদ কিছু অর্থকড়িও ছিলো। মনে হয়, এই বাক্সটিই যেহেতু সবচেয়ে বেশি হেফাযত করা হয়েছিলো তাই চোরও বুঝে গেছে, আসল জিনিস এটিতেই আছে। মোটকথা, এমন অস্বাভাবিক হেফাযতই চুরির কারণ হয়ে দাঁড়ালো!

কবি মুতানাব্বী এমনই এক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন–

الامر لله رب مجتهد
ما خاب الا لانه جاهد
و متق والسهام مرسلة
يحيد من حابص الي صادر

অর্থ: সাফল্য-ব্যর্থতার ফায়সালা তো আল্লাহরই হাতে। বহু মেহনতি মানুষ কেবল নিজ চেষ্টার কারণেই ব্যর্থ হয়। আর বহু সতর্ক লোক ছুটে আসা তীরের নিশানা থেকে সরে দাঁড়ায়, কিন্তু ঘুরে এসে তীর তাকেই বিদ্ধ করে।

এই অভাবিত চুরির ফলে আমাদের পরিবারের কারো কাছে ইহরামের কাপড় ছাড়া আর কোন পরিধেয় বস্ত্র ছিলো না। সুতরাং সেদিন ফের মিনায় পৌঁছার পর কুরবানী করে আব্বাজান, ভাইজান এবং আমার কাছে কোন সেলাইকৃত কাপড় ছিলো না। আখের হাজী দাউদ মাইত সাহেব ও তার সন্তানেরা নিজেদের কিছু কাপড় আমাদেরকে দিয়েছিলেন। তিনদিন পর্যন্ত আমরা তাদের কাপড় পরেই ছিলাম। এখন মনে নেই, পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার পর আব্বাজান কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

**(চলবে ইনশাআল্লাহ)**

অ ভি ভা ব ক স মী পে

# তালিবে ইলমের অভিভাবকদের দায়-দায়িত্ব ও সচেতনতা

মুফতী সাঈদ আহমাদ

*গত ২৯শে জুন শনিবার জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষারত তালিবে ইলমদের অভিভাবক সম্মেলনে প্রদত্ত বয়ান।*

হামদ ও সালাতের পর...

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ! আপনারা প্রিয় সন্তানের সুন্দর আগামী ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনায় আজকের এই অভিভাবক সম্মেলনে সমবেত হয়েছেন এবং দীর্ঘক্ষণ কষ্ট বরদাশত করে জামি'আর আসাতিযায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা শ্রবণ করেছেন। ইনশাআল্লাহ এই কষ্ট ও মুজাহাদা একসময় আপনাদের সন্তানের উন্নত ভবিষ্যত গঠনে সহায়ক হবে।

দেখুন! কোন অভিভাবক সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়েই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় না; সন্তানের জন্য নিয়মিত চোখের পানি ফেলে দু'আ করতে হয়। তার সুস্থতা ও নিরাপদ যিন্দেগীর জন্য দান-সদকা করতে হয়। নিজ নিজ অবস্থান থেকে সন্তানের উস্তাদ ও উলামায়ে কেরামকে যথার্থ ইজ্জত-সম্মান করতে হয়। অতঃপর অভিভাবকের আচার-আচরণ, নিয়ত-ইখলাস সব কিছু মিলিয়ে আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে আশানুরূপ সাফল্য দান করেন।

আমরা কিতাবে পড়েছি, হযরত শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী রহ. পঞ্চম শতাব্দির একজন বিখ্যাত আলেম ও প্রাজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। লোকেরা এখন যেমন মিষ্টি বা মিষ্টিদ্রব্যের ব্যবসা করে, শামসুল আঈম্মা হালওয়ায়ী রহ.-এর পিতাও সে যুগে তেমনি মিষ্টি ব্যবসায়ী ছিলেন। আরবীতে মিষ্টিকে 'হালওয়া' বলে। এই হালওয়া শব্দ থেকেই তাদের বংশীয় উপাধী 'হালওয়ায়ী' হয়ে যায়। তার পিতার ব্যাপারে জনশ্রুতি আছে, তিনি যখন নিজ সন্তান হযরত শামসুল আইম্মা রহ.-কে ইলমে দীন হাসিলের জন্য দীনী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন, তখন থেকে তার কাছে যত লোক মিষ্টি ক্রয় করতে আসতো তাদেরকে তিনি প্রাপ্য মিষ্টির চেয়ে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'আমার সন্তানকে দীন শেখার জন্য দিয়েছি, তার জন্য দু'আ করবেন– আল্লাহ যেন তাকে যোগ্য আলেম বানিয়ে দেন।'

শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ীর পিতার এই মানোবাসনাকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে কবুল করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য হযরত শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী রহ. একজন অনুসরণীয় আলেম ও নির্ভরযোগ্য ফকীহে পরিণত হয়েছেন। তার রচিত ও সংকলিত কিতাবগুলো যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে প্রামাণ্য ও তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

এ জন্যই বলছিলাম যে, পিতা-মাতা বা অভিভাবকের জন্য শুধু অর্থের যোগান দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সন্তান যেন তার আশানুরূপ বরং ততোধিক যোগ্য, প্রাজ্ঞ ও হক্কানী আলেম হতে পারে সেজন্য নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত সকলের কাছেই দু'আ চাইতে হবে যে, আল্লাহ যেন আমার সন্তানকে কবুল করেন, তার যেন দীনের সহীহ বুঝ হাসিল হয়, সে যেন দীনদারীর উপর অটল-অবিচল থাকে। এসব বলে বলে যেখানেই সুযোগ আসে সেখানেই তার জন্য দু'আ চাইতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত কিছু দান-সদকা করতে হবে– আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ রাখেন এবং বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ রাখেন।

সন্তানকে কেন আলেম বানাতে হবে, এ ব্যাপারে আপনারা এতোক্ষণ ধরে আলোচনা শুনছিলেন যে, আলেম সন্তান পরকালে নাজাতের উসীলা হবে। পরকালে সে পিতা-মাতার জন্য মহাদৌলত হয়ে দেখা দিবে। নিজ আমলের কমতির কারণে কোন আত্মীয়-স্বজন যদি জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়ে যায়, তাকেও সে জান্নাতে নিয়ে যেতে সুপারিশ করতে পারবে। কবর জীবনে যখন সমস্ত আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে তখন সন্তানের নেক আমলের সওয়াব কবরে থেকেও আপনি পেতে থাকবেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। তো এসব হলো পরকালীন স্বার্থ।

তবে সন্তানাদি যদি খাঁটি আলেম, দীনদার ও পরহেযগার হয়, তাহলে দুনিয়াতেও আপনি তার দ্বারা উপকৃত হবেন। আর সন্তান যদি দীনদার না হয় তাহলে শুধু পরকালীন ক্ষতি আর কবরজীবনের উপকার থেকেই বঞ্চিত হবেন না; বরং এ সন্তানের কারণে আপনি লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও অপদস্ত হবেন। পূর্বের আলোচনায় হুযূর বলেছেন, সন্তান বদদীন হলে নিজ ব্যস্ততা বাদ দিয়ে বা খাটো করে সে পিতা-মাতাকে কখনোই তাদের প্রাপ্য সময় দিবে না, খোঁজ-খবর নিবে না, মৃত্যুর সময় পাশে থাকবে না, থাকলেও তার দ্বারা পিতা-মাতার কোন উপকার হবে না। এমনকি দাফন-কাফনেও শরীক থাকা তার নসীবে জুটবে না। রইল পিতা-মাতার জন্য আমল করে ইসালে সওয়াব করা– তো এটা সে করবেই কীভাবে, তার তো 'কুলহুওয়াল্লাহ' পড়ারই যোগ্যতা নেই?

আমি তো বলি, শুধুমাত্র এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আপনার জীবন চলার পথে সে এক অসহ্য দুর্বিসহ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। আপনি হিংস্র জানোয়ার থেকে যেটুকু ক্ষতির সম্মুখীন না হবেন, বদদীন সন্তান দ্বারা তার চেয়েও নির্মম ক্ষতির স্বীকার হবেন। বন-জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীকে ছোট অবস্থায় ভিন্নভাবে লালন-পালন করা হলে বাঘ, ভল্লুক, সিংহ, চিতা পর্যন্ত পোষ্য হয়ে যায়, হিংস্র থাকে না; লোকেরা পরিবারসহ কোলে-পিঠে তুলে ঘুরে বেড়ায়। সেদিনও পত্রিকায় এসেছে, অস্ট্রেলিয়ায় এক আসামীকে গ্রেফতার করতে পুলিশ তার বাড়িতে হানা দেয়। কাউকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশ আসামীর পিতার ঘরে গিয়ে দেখে– বিছানায় কে যেন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। পুলিশ ধারণা করেছে, আসামীর পিতা হয়তো তার সন্তানকে লুকিয়ে রেখে হেফাযত করছে। কিন্তু যখনি কম্বল তোলা হলো, দেখা গেলো জ্যান্ত এক চিতা বাঘ, কম্বলের নিচে শুয়ে আছে। পুলিশ ভয়ে পিছু হটে চোখ বড় করে পিতার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবা তখন বললেন, সেই ছোট থেকেই চিতাটিকে আদর-যত্ন ও লালন-পালন করায় এখন এতোটাই পোষ্য হয়ে গেছে যে, ওর থেকে ক্ষতির কোন আশঙ্কাই নেই।

হিংস্র প্রাণীও লালন-পালন আর আদর-সোহাগে পোষ্য হয়ে যায়, বিপদমুক্ত,

নিরাপদ হয়ে যায়। কিন্তু সন্তান যদি দীনহীন-বদদীন হয়ে যায়, যতোই আদর-সোহাগে তাকে লালন-পালন করা হোক, সেই পোষ্য বাঘের চেয়েও বিশগুণ বেশি যত্ন করে বড় করে তোলা হোক দীনহীন সন্তান কিন্তু পোষ্য হবে না। সে ভয়ঙ্কর হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়ে যাবে। আজকে সন্তানের লেখা-পড়ার জন্য পিতা-মাতা কতোইনা কষ্ট স্বীকার করে, সেই সকাল হতে শুরু করে রাত পর্যন্ত। বাসা থেকে কোচিং, সেখান থেকে স্কুল। ফের কোচিং সেন্টার হয়ে বাসায়। পিতা-মাতার দফারফা। শুধু কি তাই! প্রত্যহ দুপুরের তীব্র রোদে পুড়ে রাস্তায় পেপার বিছিয়ে আদুরে সন্তানের অপেক্ষায় বসে থাকা, আরো যে কতো কি– সেটা বলে শেষ করা যাবে না।

এক দম্পতির একটিমাত্র ছেলে। বাবা-মা দু'জনই সন্তানকে মাদরাসায় পড়াতে রাজি। কিন্তু মা শুধুমাত্র এ কারণে শেষ পর্যন্ত মাদরাসায় দিতে পারেনি যে, তার ছেলে যদি দুষ্টুমি করে বা পড়া না পারে, তাহলে তো শিক্ষক তাকে শাস্তি দিবে। ঐ মায়ের কথা হচ্ছে, আমার ছেলের গায়ে বেত পড়বে এটা আমি কখনোই সহ্য করতে পারবো না। পিতা-মাতা সন্তানকে কতোটা আদর ও সোহাগ দিয়ে বড় করে থাকে– এতো আদর-যত্নের সন্তান যদি দীনদার না হয় তাহলে কিন্তু সেই বাঘের চেয়েও হিংস্র ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠবে।

বিষয়টি কেমন হলো? আপনি আদর-সোহাগ দিয়ে বনের হিংস্র বাঘ পোষ মানিয়ে নিলেন আর গর্ভজাত সন্তানকে আদরের নামে দীন না শিখিয়ে বাঘের চেয়ে হিংস্র বানিয়ে দিলেন। এই সন্তান একসময় আপনার দিকে চাপাতি, দা-বটি নিয়ে ছুটে আসবে। গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করবে। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় কুপিয়ে কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করবে। কাল্পনিক গল্প বলছি না, এগুলো এখন নিত্যদিনের সংবাদ শিরোনাম এবং এর বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে বিদ্যমান। কারো সন্দেহ হলে যেসব পিতা-মাতার সন্তান বালেগ হয়ে গেছে, কিন্তু দীনদার হয়ে বেড়ে ওঠেনি তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে দেখতে পারেন যে, সন্তানকেন্দ্রীক কী দুর্বিসহ যন্ত্রণা ও নির্যাতন তারা ভোগ করছেন।

যাই হোক, সন্তানকে আলেম বানাতে হবে। আলেম হওয়া ছাড়া মানুষের দীনদারীর বিন্দু পরিমাণ ভরসা নেই। একজন সাধারণ মানুষ একদিকে হয়তো দীনদার কিন্তুঅন্যদিকে সে খেয়ালে-বেখেয়ালে এমন সব কথা-বার্তা উচ্চারণ করে, যে কথায় তার ঈমান নষ্ট হওয়া নিশ্চিত।

আমাকে এক ভাই জানালেন, তিনি তার মেয়েকে জেনারেল শিক্ষিত দীনদার পাত্র দেখে বিবাহ দিয়েছেন। মেয়ে-জামাই দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে পরিপূর্ণ দীনদার। কিন্তু সে এমন এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে, যেটা কোন দীনদার করতে পারে না। সে ভাই বললেন, আমার মেয়ের সাথে ওর সামান্য একটু মনোমালিন্য হয়েছে। আমার মেয়ে ওর সামনেও ছিলো না, সে একদিন রাস্তায় চলছিলো আর মুখে তিন তালাকের কথা উচ্চারণ করছিলো। পরে সে আমাকে বললো, এটাতে কি আর তিন তালাক হবে? আমি তো মনের কথাটাই শুধু মুখে উচ্চারণ করছিলাম।

দেখুন, কত বড় আহম্মক! সে এটাও জানে না যে, মনের কথা মুখে উচ্চারণ করলেও স্ত্রী চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। সাধারণ মাসআলাটাও সে জানে না যে, কেউ না শুনলেও মুখে উচ্চারণের দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। এটাতো একটা ছোট্ট উদাহরণ। এ কারণেই বলেছি যে, যদি আলেম না হয় কিংবা কোন আলেমের দীর্ঘ সোহবত-সংস্পর্শে না থাকে তাহলে সে ব্যক্তির দীনদারীর কোনই ভ্যালু নেই। আমি সেই ভাইকে বললাম, দীনদারী দেখে তো বিবাহ দিয়েছেন, কিন্তু আলেম দেখে বিবাহ দেননি। আজকে যদি আলেম দেখে বিবাহ দিতেন, তাহলে কমপক্ষে সে আলেম জামাই মেয়ের সাথে দুর্ব্যবহার করুক আর সদ্ব্যবহার করুক অন্তত অযথা স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কাজটা করতো না। আমরা যারা ভুল করেছি– আলেম হতে পারিনি, কিন্তু এখন নিজের ভবিষ্যত ভালো চাই, পরকালীন সফলতা চাই, ছেলে হোক, মেয়ে হোক অবশ্যই সন্তানদেরকে দীনদার বানাতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে এমন এক কঠিন ও নাযুক সময় আসছে, যে সময় ঈমান-আমলের মাপকাঠিতে মাঝামাঝিরা টিকতে পারবে না। হয়তো এদিক হতে হবে, নয়তো ওদিক যেতে হবে। মাঝামাঝি থাকা কোনভাবেই চলবে না। অতএব আমরা যেন পাক্কা ঈমানদার ও পরহেযগার থাকতে পারি তার জন্য আমাদের সন্তানদেরকে দীনদার ও আলেম বানানো ছাড়া বিকল্প নেই।

এখন কথা হলো, আমরা তো সন্তানদেরকে আলেম বানানোর জন্য মাদরাসায় দিয়েছি, তারপরও দেখা যায়, কখনো সন্তান বিচ্যুত হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়, দীনী প্রতিষ্ঠান থেকে লাইনচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়ে যায়। তো এর কারণ কী? সাধারণত যেসব কারণে দীনী প্রতিষ্ঠানে দেয়ার পরও সন্তান ব্যর্থ হয়, পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না– আমরা যেসব কারণের অল্প কিছু বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

**এক.**

**অসৎ সঙ্গ থেকে নিরাপদ না রাখা।**

অসৎ সঙ্গের সংস্পর্শ সন্তানকে দীনী লাইন থেকে বিচ্যুত করে দেয়। উলামায়ে কেরামের মাঝে একটি কথার প্রচলন আছে, 'নতীজা আরযালের তাবে হয়' অর্থাৎ ভালো আর মন্দ যখন একত্রিত হয়, তখন ফলাফল মন্দ হয়ে থাকে। আপনার সন্তান অসৎ লোকের সঙ্গে গিয়ে তাকে সৎ বানিয়ে দিবে এর চেয়ে বেশি আশঙ্কা হলো সে নিজেই অসৎ হয়ে যাবে। তাই সন্তানের জীবনে যেন অসৎ সঙ্গের সুযোগই না আসে সেদিকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

**দুই.**

**শরয়ী পর্দা পালনে শিথিলতা:** সন্তান বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ থেকেই পর্দার বিধান পালনের প্রতি সচেষ্ট করে তোলা। এ ব্যাপারে সীমাহীন পর্যায়ের শিথিলতা হয়ে থাকে। অনেকেই মনে করে, আরে, এ-তো সেদিনের ছেলে তার কি আর পর্দা করতে হবে? কিংবা তার সঙ্গে কি আর পর্দা করতে হবে? এর ফলে চাচী, মামী, চাচাতো বোন, মামাতো বোন ও ফুফাতো বোন এদের সাথে পর্দার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সতর্ক থাকা হয় না। আর এতে ছেলে-মেয়ে উভয়ে খুব অল্প দিনেই লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই পর্দাহীনতাও একপ্রকার অসৎ সঙ্গ। সন্তানকে এ থেকেও বাঁচাতে হবে।

**তিন.**

**বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া:** আগে তো শুধু অসচ্ছল পরিবারের সন্তানরা মাদরাসায় পড়তো। এখন তো মা-শা-আল্লাহ সচ্ছল পরিবারের সন্তানরাও পড়ছে। কিংবা যারা সন্তানদেরকে মাদরাসায় পড়াচ্ছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক সচ্ছল করে দিচ্ছেন। যাই হোক, সম্পদের কারণে ইচ্ছা করলে থাকা-খাওয়া, চলাফেরায় উন্নত ইন্তিজাম করতে পারেন। কিন্তু আপনার খেয়াল রাখতে হবে, আমি তো আমার সন্তানকে আলেম বানাবো। তাকে তো মাদরাসায় থাকতে হবে। আপনার

জীবনযাত্রায় যদি বিলাসিতা চলে আসে তাহলে এ সন্তান আর মাদরাসায় থাকবে না; থাকতে পারবেও না। সন্তানকে আপনি এসি রুমের ব্যবস্থা করে দিলেন, একটা গাড়ি কিনে দিলেন, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুতেই প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিতে অভ্যস্ত করে তুললেন, তাহলে সে মাদরাসায় এসে নিজেকে আর মানিয়ে নিতে পারবে না।

সে মাদরাসায় এসে পরের দিনই আপনাকে রিপোর্ট করবে, বাবা! এখানে এতো গরম! এতো মশা!! বাবা! তুমি বুঝতে পারবে না, এখানে যে কী পরিমাণ কষ্ট!!! রুম পরিবর্তন করে আরেক জায়গায় দিবেন সেখানেও থাকবে না; বলবে, এই সমস্যা, সেই সমস্যা। আবার বলবে, আজকে ভাতে পোকা পাওয়া গেছে, ইত্যাদি। পোকার বাহানায় সে ধীরে ধীরে বাসায় যাওয়ার পাকা ব্যবস্থা করবে, তখন আপনার আলেম বানানোর শখ আর তাকে দিয়ে পূরণ হবে না।

আমি এক ভাইয়ের বাড়িতে গেলাম। তিনি পাঁচতলা বাড়ির মালিক। বড় ব্যবসায়ী। অথচ দেখলাম, স্টিলের গ্লাসে, মেলামাইনের প্লেটে খাওয়া-দাওয়া করছেন। ঘরের অন্যান্য আসবাবও অতি সাধারণ। জিজ্ঞেস করলাম, এমনটি কেন? ততিনি বললেন, আমার সন্তানকে আমি মাদরাসায় পড়ানোর নিয়ত করেছি। আমি যদি এখন আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সবকিছুর ব্যবস্থা করি, তাহলে ছেলেকে আর মাদরাসায় ধরে রাখতে পারবো না। তার এই সতর্কচিন্তা ও চমৎকার কৌশল আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছিল।

আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, দেশের অন্যতম বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব। তিনি অতি সাধারণ জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। আমি দাওরায়ে হাদীস সমাপন করে যখন পাকিস্তানে লেখাপড়ার ইচ্ছা করি, তখন আমি হযরতের বুয়েট ক্যাম্পাসের বাসায় গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, হযরতের বড় পুত্র মুফতী রিযওয়ানুর রহমান সাহেব থেকে কিছু পরামর্শ গ্রহণ করবো। বাসায় গিয়ে দেখলাম, উনার ড্রয়িংরুমে চৌকি তো আছে, কিন্তু বিছানা নেই। আমি খুব অবাক হলাম। বুয়েটের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির বাসার একি অবস্থা! আমার জানামতে এখনো পর্যন্ত প্রফেসর হযরতের জীবনযাত্রা তেমনি আছে। অথচ তিনি চাইলে এরচেয়ে অনেক উন্নত ও শানদার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সাদাসিধে অতি সাধারণ জীবনযাপন বেছে নিয়েছেন। এটা ছিলো সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত এবং এটাকে বলা হয়, মুজাহাদায়ে ইখতিয়ারী বা স্বেচ্ছায় কষ্টাবলম্বন। উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, সন্তানদেরকে তিনি আলেম বানাবেন, সন্তানরা যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছাকেও তেমনি পূরণ করেছেন।

সন্তানের জন্য আপনাকেও আপনার জীবনযাত্রায় অতি সাধারণ অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। আর যেখানেই দেখবেন সন্তানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আয়েশী চলাফেরার তামান্না সেখানেই তাকে ব্রেক দিতে হবে। বলতে হবে, দুনিয়ায় আমরা এতোটা আয়েশ করতে চাই না, এতোটা উন্নত জীবনের প্রয়োজন নেই আমাদের। এর বিপরীতে আপনার সামর্থ্য আছে বিধায় আপনি সন্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে আবদার করলেন, হুযূর! আমার ছেলের জন্য একটা এক্সট্রা রুম ব্যবস্থা করা যাবে?

আমাদের প্রতিষ্ঠানে একবার এক ভাই নিজ সন্তানের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন যে, হুযূর! আমাকে একটা রুম করে দেয়ার সুযোগ করে দেন। আমার ছেলের লেখাপড়া যখন শেষ হবে তখন সেই রুম ও জায়গা আপনাদের হয়ে যাবে। আমাদের মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মুরুব্বিয়ানে কেরাম অভিভাবকের সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কারণ এমনটি হলে তার সন্তান আলেম হতে পারতো না।

আর অনেকে আছে এ ধরণের পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে বাসায় আলাদা শিক্ষক রেখে– দারুল উলূম দেওবন্দের সূচনা যেমন একজন উস্তাদ ও একজন ছাত্র দ্বারা হয়েছিল তেমনি– স্বপ্ন দেখেন যে, এই পদ্ধতিতে ছেলেকে আলেম বানাবেন। অর্থাৎ একজন হাফেয রেখে দিবেন, যিনি তার ছেলেকে একা একা পড়িয়ে হাফেয বানিয়ে দিবেন। তারপর একজন মাওলানা সাহেব রাখবেন, তিনিও তাকে পড়াতে পড়াতে মাওলানা বানিয়ে দিবেন। এটা অসম্ভব ব্যাপার; এ রকম সাধারণত হয় না। প্রবাদ আছে, 'তোলা দুধে পোলা বাঁচে না।' তেমনি ঘরে পড়িয়ে হাফেয-আলেম হয় না। হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব দা.বা.-ও সন্তানদের পড়াশোনার প্রথমদিকে এরকম খেয়াল করেছিলেন যে, বাসায় একজন হাফেয সাহেব রেখে ছেলেকে হাফেয বানাবেন। তার এই ইচ্ছা একজন আলেমকে জানালে তিনি তাকে বলেছিলেন, 'আপনারা সব কামে সমাজ বোঝেন, কিন্তু এ ব্যাপারে সমাজ বোঝেন না কেন?' অর্থাৎ আর দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে একজন তালিবে ইলম যে মান ও পরিমাণের পড়াশোনা করতে পারবে, গৃহিশিক্ষক রেখে একাকী পড়িয়ে সেটা কল্পনাও করা যায় না। এজন্য এ ব্যাপারটিও ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

**চার.**

**সন্তানের হাতে টাকা-পয়সা দেয়া:** শিক্ষার্থী সন্তানের হাতে টাকা-পয়সা দেয়ার পরিবর্তে আপনি নিজে তার প্রয়োজন পুরো করে দেন। খাবার-দাবার, ফল-মূল, ভালোমন্দ যা কিছু দরকার, কষ্টকর হলেও আপনি নিজে কিংবা কারো মাধ্যমে সেগুলোর ব্যবস্থা করে দিন। তবুও সন্তানের হাতে অতিরিক্ত টাকা-পয়সা দেয়া যাবে না। এটা তার বিপথে যাওয়ার অন্যতম কারণ। প্রয়োজনে আপনি তার জরুরত পুরা করার প্রয়োজনীয় টাকাটা তার উস্তাদের কাছে রেখে আসুন, তা-ও সন্তানের হাতে সরাসরি টাকা-পয়সা দেয়া যাবে না।

**পাঁচ.**

**দীনী পরিবার নয় এমন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সন্তানকে মিশতে দেয়া:** ইতোপূর্বেও আমাদের উস্তাদ হযরতুল আল্লাম মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা. বলেছেন, সন্তানকে আলেম বানানোর জন্য আত্মীয়-স্বজনও দীনদার হতে হবে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের চাচা-চাচী, মামা-মামী, খালা-খালু, ভগ্নীপতি প্রমুখ আত্মীয়-স্বজন দীনদার নন। তো সন্তানকে এদের সাথে ঢালাওভাবে মিশতে দিলে ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে। গতকাল এক ভাইয়ের সাথে কথা হলো। তিনি তার মেয়েকে মাদরাসায় দিয়েছেন দীনদার বানানোর জন্য। কিছুদিন পর কানাডা প্রবাসী তার এক ভাই বাচ্চাকাচ্চাসহ তার বাড়িতে এসে ওঠে। দেশে থাকার জন্যই এসেছিলেন, কিন্তু সুবিধা মনে হয়নি; তিনি ছেলে-মেয়েসহ কানাডা চলে গেছেন। ইতোমধ্যে মাদরাসায় মেয়ে দেয়া ভাইটার এই 'উপকার' হয়েছে যে, তার ঐ এগারো বছর বয়সী মেয়েটার মাদরাসা ছুটে গেছে। সে মাত্র এই অল্প কয়েকদিন দীনহীন চাচাত ভাই-বোনের সঙ্গে মিশেছে। ব্যস, সে আর মাদরাসায় যাবে না। কোনভাবেই ঐ ভাইটি তার মেয়েকে আর মাদরাসায় দিতে

পারেননি। মেয়েটি এই কয়দিনেই আমূল বদলে গেছে। বদদীন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সন্তানকে অবাধে মিশতে দেয়া যে কতোটা খতরনাক হয় এ থেকে বুঝে নিন।

হ্যাঁ, আত্মীয়-স্বজন থাকলে তো তাদের সাথে আসা-যাওয়া করতে হয়, আত্মীয়তা রক্ষা করতে হয়। যদিও হযরত ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা. বলেছেন, এ ধরণের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা না করাটাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু তারপরও কখনো অপারগ হয়ে মিশতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে পড়লে আপনার সন্তানকে একা কখনোই সেখানে পাঠাবেন না। আপনি সঙ্গে যাবেন এবং যতোক্ষণ সেখানে থাকবেন কোনভাবেই ওকে তাদের সঙ্গে একাকী মিশতে দিবেন না, মতবিনিময় করতে দিবেন না। আপনি দেখাবেন যে, আপনি তাকে আদর করে হাতছাড়া করছেন না। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য হবে, তাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করছেন বা কন্ট্রোল করছেন। বিষয়টা খুবই গুরুত্বের দাবী রাখে। এটাকে হালকা মনে করলে আপনার সন্তান হাতছাড়া হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

**ছয়.**

**ঘরে পেপার-পত্রিকা রাখা:** আমরা তো সাধারণত পত্রিকার প্রধান প্রধান শিরোনাম ও আন্তর্জাতিক পাতায় একটু নজর বুলাই। মুসলিমরা কোথায় কোথায় নির্যাতিত হচ্ছে ইত্যাদি জরুরী বিষয়গুলো শুধু একনজর দেখি। দশ-বারো মিনিটে আমাদের পত্রিকা দেখা শেষ। বিজ্ঞাপন, বিনোদন পাতা, যেখানে মেয়েদের ছবি থাকে, সেগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কখনোই দেখা হয় না বা আমরা দেখি না। কিন্তু আপনি যদি সেই পত্রিকাটা বাসায় নিয়ে যান তাহলে আপনার সন্তান কিন্তু শুধু সেই বিজ্ঞাপন, বিনোদন পাতা ও লাইফস্টাইলের পাতাটিই দেখবে। কারণ, তার আগ্রহই হচ্ছে বিজ্ঞাপন আর বিনোদন পাতা। আমরা তো বলি, সন্তানের মা-ও যেন পত্রিকা না পড়ে। তারও দুনিয়াদারী সম্পর্কে এতো জানার প্রয়োজন নেই। আপনার স্ত্রী বলতে পারে, এতায়াতীরা টঙ্গীতে আমাদের ছাত্রদের উপর এতো বড় হামলা করলো, পত্রিকায় কতো ছবি ছাপা হল, আপনি তো ঘরে একটা পত্রিকাও আনলেন না? একটা পত্রিকা হলে তো আমরাও এক-আধটু জানতে পারতাম! তো এক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে যে, দরকার নেই, আমরা দেখেছি তাতেই হবে, প্রয়োজনে আমার মুখে শুনে নাও; তবুও তোমাদের পত্রিকা দেখার দরকার নেই। নিয়মিত বাসায় পত্রিকা রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি মাঝে-মধ্যেও এসব পত্রিকা ঘরে না রাখা উচিত। দীনী পত্রিকা, যেগুলোতে ছবি নেই বা মুরুব্বীগণ যেসব কিতাব-পুস্তক পড়ার পরামর্শ দেন, সেগুলো ঘরে রাখবো। সন্তান যদি গল্প-উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে এতেও সন্তানের দীনদারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

**সাত.**

**দীনী শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষার সার্টিফিকেট অর্জন করা:** অনেক অভিভাবক মনে করে, আমি জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত, তো ছেলেটাকেও এমন একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করি, যেখানে সে স্বাভাবিক পড়াশোনার পাশাপাশি এসএসসি বা আলিয়াও পরীক্ষা দিতে পারবে। মনে রাখবেন, সে যদি এসএসসি বা আলিয়ায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে তাকে আর আপনি মুহাক্কিক ও বা-আমল আলেম বানাতে পারবেন না। সে কিন্তু তখন এই রাস্তা থেকে ওই রাস্তায় চলে যাবে।

এক তালিবে ইলমকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই-বোন কতজন? বললো, তিনজন। কে কী করছে? বললো, দুই ভাই মাদরাসায় আর এক ভাই কলেজে সাইন্স নিয়ে পড়ছে। খটকা লাগল, দুই ভাই মাদরাসায় আর এক ভাই সাইন্স পড়ছে? খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেই ভাইটিও মাদরাসায় পড়তো। কিন্তু কোন এক মাদরাসায় পড়াকালীন গোপনে গোপনে আলিয়ায় পরীক্ষা দিয়েছিলো। তখন স্পষ্ট হয়ে গেলো, মাদরাসা লাইন বাদ দিয়ে কেন সে এখন সাইন্স নিয়ে পড়ছে। আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, আপনার সন্তান যদি এ জাতীয় কোন পরীক্ষার সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে সে আর এই লাইনে থাকবে না। সে তখন আল্লাহর গোলামীর পরিবর্তে সরকার আর মানুষের গোলামী করতে পারাকেই নিজের সফলতা মনে করবে। এ কারণে আপনি ধরে নিতে পারেন যে, সন্তানকে কওমীর পাশাপাশি স্কুলে বা আলিয়ায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে সে নিশ্চিত লাইনচ্যুত হয়ে যাবে।

**আট.**

**ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানদের পরস্পরে বিভক্ত করে রাখা:** অর্থাৎ এক সন্তানকে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত করা আর অন্য সন্তানকে দীন শিক্ষায় নিয়োজিত করা। এক্ষেত্রে যে সন্তানটি দীন শিখছে সে জেনারেল শিক্ষারত সন্তানের প্রভাবে লাইনচ্যুত হয়ে যাবে। সর্বদা সে হীনম্মন্যতায় ভুগবে। একসময় দীন-দুনিয়া কোন শিক্ষাই তার অর্জিত হবে না। এক সন্তানকে ডাক্তার, একজনকে ইঞ্জিনিয়ার, একজনকে প্রফেসর, একজনকে মাওলানা বানানোর স্বপ্ন দেখলে হয়তো আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা প্রফেসর বানাতে পারবেন; কিন্তু তাদের মধ্য থেকে এক সন্তানকে মাওলানা বানানো সম্ভবপর নয়। যদি সন্তানকে আলেম বানাতে চান তাহলে সব সন্তানকেই দীন শিক্ষা করার জন্য দিতে হবে; কোন তারতম্য করা যাবে না। অনেকে ছেলেদেরকে মাদরাসায় দিয়ে দেয়; কিন্তু মেয়েটাকে আলিয়া কিংবা স্কুল-কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়। তারা মনে করে, মেয়েকে বিবাহ-শাদী দিতে হবে, কিছু লেখাপড়া না করালে কিভাবে হবে? এতে অসুবিধা কোথায়! আমার মেয়ে তো পর্দা করেই যাওয়া-আসা করবে! কিন্তু স্কুল-কলেজে গিয়ে মেয়ে যে কতোটা 'বুঝমান' হয়ে যাবে এবং তার মনমানসিকতা কতোটা বদলে যাবে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না। বোরকা পরিহিত অবস্থায়ই সে এতোটা দূরে চলে যাবে যে, আপনি আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

পিতা-মাতারা সাধারণত সন্তানের প্রতি অতি সুধারণা রাখে। তারা মনে করে– আজকাল কতো মেয়েরা 'বয়ফ্রেন্ড' নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ছেলেদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখে; কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আমার মেয়েটা এসবের মধ্যে নেই! এসব বলে বলে গর্ব করে আর তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। সময় হলে দেখা যায়, বাবা-মা মেয়ের বিবাহের জন্য যে ছেলেরই প্রস্তাব আনে, মেয়ে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কৌশলে এড়িয়ে যায়। বাবা জিজ্ঞেস করে, তোর কোন পছন্দ থাকলে বল্? মেয়ে তখন দারুণ এক কূটিল জবাব দেয়– আমার কোন পছন্দ থাকলে কি আর তোমাদেরকে শেয়ার করা ছাড়া থাকবো? পাত্র খুঁজতে খুঁজতে একপর্যায়ে বাবা-মা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, দেখা যায় কোন এক দুপুরে মেয়ে এসে বাবাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে– আব্বু! ওঠো! ওঠো...! হতচকিত বাবা চেয়ে দেখে মেয়ের পাশে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। সংকোচহীন মেয়ে বলে ওঠে, বাবা! তুমিতো অনেক সম্বন্ধ আনলা, কোনটাই তো মিল খেলো না;

এর সাথে তুমি একটু কথা বলে দেখো তো, পছন্দ হয় কিনা? তার মানে এই ছেলের সাথে তার অনেক আগে থেকেই সম্পর্ক। কিন্তু বাবার কাছে এতোটাই গোপন রেখেছে যে, বাবা মনে করতো– আমার মেয়ে তো নিষ্পাপ, বোরকা পরে আসা-যাওয়া করে, তাকে কিভাবে ছেলেরা চিনবে? যার গায়ে রোদ লাগে না, তার পেছনে ছেলে লাগবে কি করে? অথচ সে বোরকার আড়ালে বহু আগে থেকেই ছেলে পুষতো। অবশেষে বাবা-মা হতভম্ব হয়ে যায়, বেকুব বনে যায়।

এক বাবার কথা জানি, এ অবস্থার শিকার হয়ে স্ট্রোক করেছে। সন্তানকেও বয়কট করেছে। কিন্তু অসময়ের এই বয়কটে লাভ কী হবে? সন্তানের মা বলে, যেভাবেই হোক, যার দোষেই হোক, পরিস্থিতি যখন হাতছাড়া হয়েই গেছে, সম্পর্ক যখন করেই ফেলেছে, তো বিবাহটা দিয়ে দিই– অন্তত সামাজিক সম্মানটা রক্ষা পাক। মামারা বলে, কী আর করা, তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। কিন্তু অভিমান কতোদিন ধরে রাখা যায়? প্রবাদ আছে, পানি কাটলে ভাগ করা যায় না। সন্তান তো ঔরসজাত, তাকে আলাদা করে পিতা-মাতা কিভাবে থাকবে?

সুতরাং এই ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখতে হবে যে, সন্তানদেরকে যদি দীনের আলেম বানাতে চান তাহলে তাদেরকে দুই জাতীয় শিক্ষালয়ে দিয়ে ভাগ করা যাবে না। সকল সন্তানকে একই দীনী লাইনে দিতে হবে।

**নয়.**

**পিতা-মাতার আপোসের বিরোধ সন্তানদের সামনে প্রকাশ করা:**

কোন বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ হতেই পারে। একজন সহজ স্বভাবের আর একজন রুক্ষ মেজাযের, একজন খুবই সচেতন অপরজন ঠিক ততোটাই গাফেল। এসব কারণে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই কিছুটা অমিল হতে পারে। তাই বলে, সেটা সন্তানের সামনে দৃশ্যমান হতে পারবে না। ওদের সামনে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। আর সন্তানের পড়ালেখার ব্যাপারে পিতা-মাতার দু'রকম সিদ্ধান্ত হতে পারবে না। একজন চায় আলেম বানাতে, অপরজন চায় ভিন্ন কিছু। কিংবা সন্তান অপরাধ করে বাবার কাছে প্রশ্রয় পায় আর মায়ের হাতে মার খায়। সন্তানের সামনে যদি পিতা-মাতার এমন বিরোধ লেগেই থাকে তাহলে সে সন্তানকে আলেম কেনো সাধারণ মানুষও বানানো সম্ভবপর নয়।

**দশ.**

**পিতা-মাতার অতি ব্যস্ততা:** সন্তান আলেমরূপে গড়ে না ওঠার এটাও অন্যতম কারণ যে, পিতা-মাতা এতো বেশি ব্যস্ত যে, সন্তানের জন্য চিন্তা-ফিকির করার সুযোগই তার নেই। আচ্ছা, আপনার এতো ব্যস্ততা কিসের জন্য? ছেলে-মেয়ের সচ্ছল ভবিষ্যতের জন্যই তো! তাহলে সন্তানের জন্য চিন্তা-ফিকির করার প্রতিবন্ধক যে ব্যস্ততা– আপনি তা কমিয়ে দিন– এতে আপনার সম্পদ জমানোয় ক্ষতি হলে হোক, সম্পদ কিছুটা কম আসলে কমই আসুক। আপনাকে মনে রাখতে হবে, সন্তান ও সম্পদ এ দু'টোর মধ্যে সন্তানই আপনার ভবিষ্যতের জন্য অধিক উপকারী এবং বেশি দামী। তাই সন্তানের পড়ালেখার খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে যদি আপনার কোন ডিগ্রী অর্জন বাদ দিতে হয় অথবা অফিসের অতিরিক্ত ডিউটি বাদ দিতে হয়, দিবেন; তবুও সন্তানের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ও নজরদারী নিশ্চিত করুন।

এক্ষেত্রেও আবার আমাদের সেই প্রফেসর হযরত হামীদুর রহমান সাহেবের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হয়। হযরতের বড় পুত্র মুফতী রিযওয়ানুর রহমান সাহেব যখন হিফযুল কুরআন বিভাগে পড়েন, তখন প্রফেসর হযরতের লন্ডন থেকে উচ্চ ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ আসে। কিন্তু তিনি সেই উচ্চ ডিগ্রীর হাতছানি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য লন্ডন যাওয়া বাদ দিলেন। সময় দিলেন সন্তানদের। যার ফলে হযরতের সবগুলো সন্তান আজ যোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত আলেমে দীন। আপনার যদি তামান্না থাকে যে, সন্তান ভালো আলেম হোক, হাফেযে কুরআন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুক, তাহলে এমন কোন ব্যস্ততা, যার জন্য আপনার সন্তানের দেখ-ভালের কমতি আসে সেটা আপনাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে। আপনার দুনিয়াবী ক্ষতি হোক, কিন্তু আখেরাতের যেন কোন ক্ষতি না হয়, সম্পদের ক্ষতি হোক, কিন্তু সন্তানের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

**এগারো.**

**পারিবারিক প্রোগামগুলোর দিন-ক্ষণ নির্ধারণে তালিবে ইলম সন্তানের পড়াশোনাকে অগ্রাধিকার না দেয়া:**

আরেকটি বিষয় বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, আগে আপনার পরিপূর্ণ দীনী বুঝ ছিলো না, ফলে এক সন্তানকে জেনারেল শিক্ষায় দিয়েছেন। এখন দীনের সমঝ এসেছে, তো আরেক সন্তানকে মাদরাসায় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, কোনভাবেই যেন আপনার মাদরাসা পড়ুয়া সন্তানটি অবহেলার শিকার না হয়। সর্বক্ষেত্রে স্কুল পড়ুয়া সন্তানের চেয়ে মাদরাসা পড়ুয়া সন্তানটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মনে করুন, মেয়ের বিবাহের তারিখ ঠিক করবেন, তো সেটা যেন যে সন্তানটি মাদরাসায় পড়ছে তার ক্লাস চলাকালীন কোনভাবেই না পড়ে। একান্ত যদি কোনভাবেই ওর ছুটির সময় মিলানো সম্ভবপর না হয় তাহলে এই প্রোগ্রামের কথা সন্তানকে জানতেই দিবেন না। বিবাহের দিন যদি আপনার আত্মীয়পক্ষ জিজ্ঞেস করেই বসে– আপনার সেই সন্তানটি কোথায়? তখন উঁচু গলায় বলে দিবেন, 'ওর মাদরাসা খোলা যাচ্ছে, সবক বন্ধ রেখে ওকে আনা যাবে না।' তাহলে দেখবেন, আপনার সন্তানের দিল বড় হবে। ঐ আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে আপনার ও আপনার সন্তানের প্রতি আলাদা শ্রদ্ধা পয়দা হবে।

**বারো.**

**উপস্থিত হওয়া সমীচীন নয় এমন দাওয়াতেও সন্তানকে নিয়ে যাওয়া:**

অনেক সময় এমন হয় যে, কোন বিশেষ প্রোগ্রামে বাধ্য হয়ে নিজেকে শরীক রাখতে হয়, তাহলে কোনভাবেই সেখানে সন্তানকে নিবেন না। শুধু আপনি হাজিরা দিয়ে প্রয়োজন সেরে চলে আসবেন।

আসলে এক্ষেত্রে দেখা যায়, আপনাকে যিনি দাওয়াত দিয়েছেন তিনি তো দীনদার, কিন্তু তিনি আরো অন্যান্য যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন তারা সবাই দীনদার নয়। এমতাবস্থায় কোনভাবেই আপনার সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। সন্তানের যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আমার মনে আছে, আমি যখন করাচিতে পড়াশোনা করি, তখন শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.-এর বড় পুত্রের আকদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিবাহের ওলীমার জন্য বিশাল মাঠে বড় বড় দু'টো পার্টিসেন্টার ভাড়া করা হয়। একটা সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের জন্য, আর আরেকটা পুরুষদের জন্য। যথার্থ সুন্দর ব্যবস্থা, পর্দা-পুশিদার বিন্দুমাত্র কমতি নেই। অনুষ্ঠানে অনেক বড় বড় ব্যক্তিদেরও দাওয়াত দেয়া হয়েছে। ডক্টর ওয়াহবাহ আব্দুস সাত্তার যুহালী, শাইখ আবূ গুদ্দাহর মতো পৃথিবী বিখ্যাত আলেমগণও উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের বিভাগীয় যিম্মাদার ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ সাহেব। তিনি অনুষ্ঠান থেকে এসে বললেন, ব্যবস্থাপনা তো

পুরুষ ও মহিলাদের আলাদাই করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পুরুষদের সামিয়ানার সামনে দেখলাম একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সে-তো ছেলে না; দিব্যি এক মেয়ে! এটাকেই তিনি তার মতো করে বলেছিলেন–

*ہم نے تو سمجھا تھا یہ ایک لڑکا ہے لیکن اچھی طرح دیکھا تو وہ ایک لڑکی ہے۔*

তো দেখুন! এটা হলো শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.-এর ছেলের ওলীমার ঘটনা। আপনি বর্তমান যামানায় এর চেয়ে বড় আর কোন বুযুর্গ-পুত্রের ওলীমায় যাবেন? আপনি যেখানে যাবেন সে ওলীমায় তো এমন অনেক মেহমান আগমন করবেন, যাদের ব্যাপারে আপনি তো মনে করবেন তারা পুরুষ, কিন্তু মূলত তারা মহিলা।

তাই এসব অনুষ্ঠানে গিয়ে নিশ্চিতভাবেই এমন পরিস্থিতির স্বীকার হতে হবে। তাই আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে বুঝাতে হবে, এসব অনুষ্ঠান তোমার জন্য ক্ষতিকর। আমরা কেবল বাধ্য হয়ে তাতে যাচ্ছি। তোমাদের যাওয়া মোটেও উচিত হবে না।

**তেরো.**

**অভিভাবকের হারাম উপার্জন:**

অনেক সময় দেখা যায়, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু সন্তান পড়াশোনায় মনোযোগী হচ্ছে না। বহু চেষ্টা-সাধনা করেও শেষ পর্যন্ত তাকে দীনী প্রতিষ্ঠানে রাখা যাচ্ছে না; মাঝপথেই ঝরে যাচ্ছে অথবা কোনমতে পড়াশোনা শেষ করলেও দীনদার পরহেযগার হয়ে উঠছে না। এদিকে উস্তাদ, অভিভাবক সবাই মিলেও এর কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটা অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকের হারাম উপার্জনের মন্দপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে, যে শরীর হারাম উপার্জন দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তো পিতার বা অভিভাবকের হারাম উপার্জনের গোনাহ বা দায় যদিও সন্তান বা পোষ্যের ওপর বর্তায় না, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত মন্দ প্রভাব থেকেও সে রক্ষা পায় না। এজন্য অভিভাবকের কর্তব্য হল, সন্তানকে আলেম বানাতে চাইলে নিজ আয়-উপার্জন হালাল ও বৈধ রাখা। অন্তত তালিবে ইলম সন্তানের ব্যয়নির্বাহ হালাল মাল দ্বারা সম্পন্ন করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং আমাদের সন্তানদেরকে দীনদার, পরহেযগার ও আলেমে বা-আমল দেখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**অনুলিখন : মাওলানা আব্দুল হান্নান**
**শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭**

**(৭ পৃষ্ঠার পর; একনজরে হজ্জের আমল)**

এর মধ্যে যদি কোনো দিন শুক্রবার হয় তাহলে মিনায় জুমু'আ পড়তে হবে। কারণ এটা শহর বা শহরতলী। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৫৫৩)

(গ) যে ব্যক্তি দেশে থাকা অবস্থায় প্রতি বছর কুরবানী করতো, নেসাবের মালিক হওয়ার কারণে মুকীম হয়ে যাওয়ায় তার ঐ কুরবানী বহাল থাকবে। তবে এই কুরবানী চাইলে সে দেশেও করতে পারে, আবার সেখানেও করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, হজ্জের কুরবানী ভিন্ন, যা তামাত্তু বা কিরান করার কারণে হারামের সীমানায় ১২ই জিলহজের মধ্যে করতে হয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী; /৫১৫)

**মহিলাদের কিছু ভুল**

(ক) অনেক মহিলা ইহরাম অবস্থায় চেহারা খোলা রাখে। মাসআলা হলো, হজ্জের সফরেও পূর্ণ পর্দা রক্ষা করতে হবে অর্থাৎ চেহারা খোলা রাখা যাবে না। তবে বোরকার নেকাবটি সতর্কতার সাথে এমনভাবে চেহারার উপর ফেলে রাখবে যাতে সেটা চেহারার সাথে লেগে না থাকে। সুতরাং এর জন্য এমন কিছু ব্যবহার করতে হবে, যাতে নেকাব চেহারার সাথে লেগে না থাকে। আমাদের দেশে বাইতুল মুকাররম মার্কেটে এবং অন্যান্য জায়গায় খেলোয়াড়দের ক্যাপের মত মাথার বেল্ট পাওয়া যায়, যার সামনের দিকটা মাথা থেকে কিছুটা বর্ধিত থাকে। মহিলারা এই ক্যাপ পরে তার উপর দিয়ে বোরকার নেকাব ফেলে দিলে নেকাবটি আর চেহারার সাথে লেগে থাকে না। বাতাসে উড়ে লেগে গেলে এতে সমস্যা হবে না।

(খ) মহিলাদের জন্য ওয়াক্তিয়া নামাযে মসজিদে হারামের জামা'আতে শরীক হওয়া এবং জুমুআয় যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী। অথচ দেখা যায় যে, মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে যাচ্ছে। এর কারণে একদিকে ভিড় বেশি হচ্ছে, অপরদিকে পর্দা লঙ্ঘনের কারণে তারাও গোনাহগার হচ্ছে, পুরুষদেরকেও গোনাহগার বানাচ্ছে। মহিলারা তো জামা'আতে যাচ্ছে ফযীলত হাসিলের জন্য, অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য হচ্ছে, কোনো মহিলা হজ্জ-উমরায় এসে ঘরে নামায পড়লেও সে ঘরে বসেই এক লাখ রাকআতের চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে। (মুসনাদে আহমাদ; হা. নং-২৬৫৯৮, ২৬৬২৬)

তেমনিভাবে মদীনার মসজিদে নববী থেকেও মহিলাদের জন্য ঘরের নামাযের ফযীলত বেশি। অতএব মহিলারা পাঁচওয়াক্ত নামায পড়তেও মসজিদে যাবে না এবং জুমুআয়ও যাবে না। তবে তাওয়াফ করতে গিয়ে যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে সে সময় ঠেকাবশত তারা 'মহিলাদের নামায আদায়ের নির্ধারিত স্থান'-এ নামায পড়ে নিতে পারবে, চাই এই তাওয়াফ হজ্জের হোক বা উমরার হোক, বা নফল হোক।

**কয়েকটি মারাত্মক ভুল**

(ক) এক শ্রেণির হাজী সাহেব মোবাইল বা ক্যামেরা দিয়ে বেধড়ক ছবি তুলতে থাকে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রাণির ছবি তোলা হারাম কাজ। (বুখারী শরীফ; হা.নং ৫৯৫০)। তো একজন হাজী সাহেব হারাম শরীফের মধ্যে এবং নবীজীর শহরে গিয়ে এই হারাম কাজ করছে। হজ্জের সফরে হারাম কাজ করলে তো হজ্জে মাবরূর নসীব হয় না।

(খ) ইহরাম খোলার সময় পুরুষদের জন্য শরীয়তের নির্দেশ হল, শুধু মাথা মুণ্ডানো। কিন্তু অনেক হাজী সাহেব মাথা মুণ্ডানোর সাথে সাথে দাড়িও মুণ্ডিয়ে ফেলে। অথচ পুরুষদের জন্য একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। মুণ্ডানো বা একমুষ্টির ভেতরে কাটা-ছাঁটা বিলকুল হারাম। হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন, 'ও হাজী সাহেব! তুমি দেশেও অন্যায় কাজ করতে, এখন আল্লাহর ঘরে গিয়েও সেই কাজ করলে! এভাবে তোমার কয়েক লাখ টাকার হজ্জ তো ওখানেই দাফন করে আসলে।'

কেননা, হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, দাড়ি-কাটা ব্যক্তি নবীজীর সুন্নাত বিনষ্টের মাধ্যমে মূলত নবীজীর কলিজায় ক্ষুর চালায়। সুতরাং কেউ যখন দাড়ি কাটা অবস্থায় নবীজীর রওযার সামনে গিয়ে 'আস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বলে, তখন হয়তো নবীজী নিজ চেহারা মোবারক অন্য দিকে ফিরিয়ে নেন! তো এ অবস্থায় একশ' বার হজ্জ করলেও তো হজ্জে মাবরূর নসীব না হওয়ার কথা।

আল্লাহ তা'আলা বাইতুল্লাহর সকল মুসাফিরকে হজ্জে মাবরূর নসীব করুন। আমীন।

বাংলার ইসলামী রেনেসাঁর সেনানায়ক, বিংশ শতাব্দির কিংবদন্তী, দাওয়াতী মেহনতের গোড়াপত্তনকারী

# মুজাহিদে আযম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.

মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী

পাকিস্তান আমলের কথা। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তখন ক্ষমতায়। যার নাম শুনে মানুষের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। ১৯৬৬ সনে পূর্ব পাকিস্তানে এলেন। আগামী নির্বাচনে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে গভর্ণর হাউজে আলেম সমাজকে ডাকলেন। ইসলামের জন্য নিজের অবদানের কথা উল্লেখপূর্বক আগামী দিনে আরো বেশি খিদমত করার আশাবাদ ব্যক্ত করে উলামা সমাজের সমর্থন চাইলেন।

আইয়ুব খানের কথার মাঝেই দাঁড়িয়ে গেলেন এক সিংহপুরুষ। তেজোদ্দীপ্ত তার কণ্ঠ। বলিষ্ঠ তার ভাষা। ইলাহী শক্তিতে বলিয়ান তার হৃদয়। বললেন, আপনি ইসলামের জন্য কিছুই করেননি। মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেছেন। ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম আইয়ুব খান। বললেন, জানা আছে! আপনি কার সাথে কথা বলছেন? আমি পাকিস্তানের একচ্ছত্র প্রেসিডেন্ট; পাঠানের বাচ্চা পাঠান। সেই সিংহ পুরুষের ভাষা আরো তেজোদ্দীপ্ত। বললেন, আপনার খবর আছে! আমি মুসলমানের বাচ্চা মুসলমান। আমি একা নই; আমার পিছে দাঁড়িয়ে আছে দশ কোটি মুসলমান। আইয়ুব খান খেই হারিয়ে ফেললেন।

এবার টাকার বিনিময়ে কণ্ঠরোধের পাঁয়তারা। বললেন, এটি সাত লাখ টাকার চেক; নিয়ে নীরবে চলে যান। তিনি আরো গর্জে উঠলেন। বললেন, প্রয়োজনে চৌদ্দ লক্ষ মানুষ থেকে আটআনা করে চাঁদা নিবো। তাদেরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিবো। দীনের খিদমতের জন্য আপনার এই অর্থের প্রয়োজন নেই। এই ফাসেকের সাথে কথা বলে লাভ নেই– বলে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে গভর্নর হাউজ থেকে বেরিয়ে এলেন।

কে এই সিংহহৃদয়, কী তার পরিচয়? তিনি হলেন বাংলার দুর্লভ প্রতিভা, যুগের দিশারী, আধ্যাত্মিক রাহবার, মুজাহিদে আযম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (সদর সাহেব হুযূর) রহ.। সংস্কার আন্দোলনকে যিনি জীবনের নেশা আর দিন-রাতের পেশা বানিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন চিত্তের ধনে বিত্তবান, কঠিন সময় ও পরিস্থিতিতে নির্ভীক, দুঃসাহসী। যার দায়িত্ববোধ ছিলো অত্যন্ত প্রখর। যিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান, কর্মঠ মানুষের প্রতিচ্ছবি।

রাজ দরবার থেকে নিঝুম পল্লী পর্যন্ত যেখানেই ইসলাম বিরোধী কোন কিছু লক্ষ্য করতেন সেখানেই বজ্র হুংকার ছেড়ে প্রতিবাদমুখর হতেন। জনসচেতনতা সৃষ্টি করতেন। ধর্মীয় যে কোন সঙ্কটে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। খ্রিস্টান মিশনারী ও পাদ্রীদের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক প্রচারণা ও কলমযুদ্ধ চালিয়েছেন। ঈমান ও শরীয়তের প্রশ্নে এই আপোষহীনতার কারণেই তিনি ‘মুজাহিদে আযম’ উপাধীতে ভূষিত হন।

দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষা সমাপন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামি‘আ ইউনুসিয়ায় ‘সদরুল মুদাররিস’ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দেশে আসেন। সেখানে তাকে সকলে ‘সদর সাহেব’ নামে ডাকতো। পরবর্তীতে বড় কাটারায়, লালবাগে তথা গোটা দেশেই তিনি ‘সদর সাহেব’ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

হযরত সদর সাহেব রহ. ও হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. উভয়ে যেন একই রত্নগর্ভা মায়ের দুই সন্তান। দুই নক্ষত্র, দুই দিকপাল। একই সাথে কেটেছে তাদের স্বপ্নের শৈশব, প্রাণবন্ত কৈশোর। হযরত সদর সাহেব রহ.-এর স্মৃতিচারণ করে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. কোন এক সেমিনারে এভাবে অভিব্যক্তি পেশ করেছিলেন,

‘হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী ছিলেন আমার সের-তাজ। মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় আমরা দু’জন কাফিয়া জামাআতে ভর্তি হয়ে মেশকাত পর্যন্ত একসঙ্গে পড়ি। এরপর তিনি দেওবন্দ চলে যান আর আমি সাহারানপুরেই থেকে যাই। সে সময় তার চলাফেরা আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করে। আমি তার কাছ থেকে মনুষ্যত্ব হাসিল করেছি। যদিও তিনি আমার সহপাঠী, তথাপি তিনি ছিলেন আমার উস্তাদের মতো। হযরত থানবী রহ.-এর মাওয়ায়েয, রেসালা সর্বদা তার সাথেই থাকতো। ছুটির দিনে তিনি সর্বদা থানাভবনে ছুটে যেতেন। সদর সাহেবের উসীলায় আমার সর্বপ্রথম থানাভবনে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। তার কারণেই আমি আজ এই সৌভাগ্যের অধিকারী। তার শুকরিয়া আদায় করে আমি শেষ করতে পারবো না।

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসলই বড় কাটারা মাদরাসা। এখান থেকেই আরো বহু মাদরাসা গড়ে তোলার ব্যাপারে তার ভূমিকা কার্যকরী ছিলো। তার সাথে থেকে আমার অনেক ফায়দা হয়েছে। আমি তার থেকে আখলাক ও যাহেরী-বাতেনী অনেক তারাক্কী পেয়েছি। তার সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেই হয়তো আল্লাহ পাক আমাকে কিছু নসীব করেছেন।’

ধর্মীয় অঙ্গনে হযরত সদর সাহেব রহ.-এর গৌরবজ্জ্বল কীর্তির জীবন্ত নিদর্শন হয়ে শির উঁচু করে আজো দাঁড়িয়ে আছে– ঐতিহ্যবাহী বড় কাটারা, লালবাগ, ফরিদাবাদ, গওহরডাঙ্গা মাদরাসাসহ অসংখ্য দীনী প্রতিষ্ঠান। সেই মহান সাধকের আলোকিত জীবনের কিছু দিক সংক্ষিপ্তাকারে পাঠক সমীপে পেশ করা হচ্ছে।

**জন্ম**

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ) টুঙ্গিপাড়া থানার গওহরডাঙ্গা গ্রামে ১৮৯৫ সনে সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করেন হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.। পিতা আব্দুল্লাহ, মাতা আমেনা ভেবে-চিন্তে সন্তানের নাম রাখলেন ‘শামসুল হক’ তথা চির সত্যের অম্লান সূর্য।

**ঈমানের বীজ বপন**

রত্নগর্ভা মহিয়সী মা আমেনার কাছে আলিফ-বা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি। দেখতে দেখতে ছোট ছোট কয়েকটি সূরা ও দু‘আ-দুরূদ শিখে ফেললেন। শিশুকাল থেকে পিতার সাথে মসজিদে যান, সকলের দেখাদেখি রুকু-সিজদা করেন, দু’হাত তুলে দু‘আ

করেন। কখনো বা নির্জনে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠের অনুকরণ করেন। সে দৃশ্য দেখে সকলের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নিশ্চয় এ অঙ্কুরের মাঝেই লুকিয়ে আছে এক বিরাট মহীরুহ, এক মহান সম্ভাবনা।

**বাল্যশিক্ষা : পূজামণ্ডপে সত্যের রবি**

আশেপাশে কোথাও কোন স্কুল-মাদরাসা নেই। নেই শিক্ষা-দীক্ষার ভালো কোন ব্যবস্থা। পাটগাতীর পূজামণ্ডপে এক হিন্দু পণ্ডিত বাবুর পাঠশালা। ওঁম দেবতার নাম নিয়ে যার পাঠদান শুরু হয়। সেখানে শিশু শামসুল হকের বর্ণমালার হাতেখড়ি হয়। এরপর পূর্ণচন্দ্র বাবুর পাঠশালায় এক বছরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে ফেলেন।

আল্লাহর কী অপার মহিমা। আগামী দিনে যিনি হবেন তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী, যিনি শিরকের বেড়াজাল ছিন্ন করে জাতিকে মুক্তির দিশা দিবেন, আজ তিনি শিরকের আড্ডাখানা, পূজামণ্ডপে বসে শিক্ষা নিচ্ছেন। বাড়ি থেকে বেশ দূরে ছিলো মুন্সি আজিজুল হকের পাঠশালা। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করে চলে যান পার্শ্ববর্তী জেলার নাজিরপুরে। সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ শেষ করেন।

এদিকে বাংলা পড়ায় আর মন বসছে না তার। সারাক্ষণ চিন্তা করেন কিভাবে কুরআন শিখা যাবে। নীরবে নির্জনে কুরআন শরীফে চুমু খান, বুকে চেপে ধরে হু-হু করে কাঁদেন। কখনো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, হে মালিক! আমাকে তোমার কালাম বোঝার তাওফীক দাও, তোমার মনোনীত পথে পরিচালিত করো।

**বাস্তবদর্শী পিতার যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত**

ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাহিনীর সেই সতেরো জন বীর রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী আক্রমণ করেছিলেন। যারা সর্বপ্রথম বাংলার আকাশে তাওহীদী নিশান উড়িয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন হযরত সদর সাহেব রহ.-এর পূর্বপুরুষ। তার পূর্বপুরুষদের আরেকজন হলেন 'জনাব চাঁদ গাজী'। যিনি সৈয়দ আহমাদ শহীদ বেরলবী রহ. এর ইংরেজ বিরোধী জিহাদী কাফেলার একজন অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন। এই বিপ্লবী রক্তধারা তার পূর্বপুরুষের সকলের শিরায় শিরায় প্রবহমান ছিলো। সদর সাহেব হুযূর রহ.-এর পিতা আব্দুল্লাহও ছিলেন ইংরেজ খেদাও দর্শনে উজ্জীবিত। তিনি দেখেছেন অতীতে কতোভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা হলো এবং কিভাবে তা ব্যর্থ হয়ে গেলো। তাই তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পারলেন, ইংরেজদের তাড়াতে হলে সবার আগে ইংরেজি ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করে এমন এক মহান সিপাহসালার তৈরি করতে হবে, যার মাঝে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানের পূর্ণমাত্রায় সমাবেশ ঘটবে। তারপর ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

**পিতা-পুত্রের চিন্তার বৈষম্য**

পিতা-পুত্রের চিন্তার বৈষম্যের মাঝেও সদর সাহেব রহ. জীবনে কখনো পিতার অবাধ্য হননি। কৌশলে নিজ লক্ষ্য পানে ছুটে চলেছেন। পিতার ইচ্ছায় তাকে ডিমাডাঙ্গার প্রবীণ শিক্ষাবিদ শরীফ শামসুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। তিনি কলকাতা যাওয়ার পথে যশোর নওয়াপাড়ার প্রসিদ্ধ ভাগুটিয়া হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। তার লেখাপড়ায় মনোযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং উন্নত চরিত্র-মাধুর্যে বিমোহিত হলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তিনি সেখানে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সদর সাহেবের সততায় অভিভূত হয়ে হিন্দু হেড মাস্টার এক সভায় তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন– শামসুল হকের হাতে পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন তুলে দেয়া হলেও কোন চিন্তা থাকবে না।

নওয়াপাড়ায় ষষ্ঠ শ্রেণী শেষ করে চলে গেলেন কলকাতা আলিয়ায়। সেখানে সপ্তম শ্রেণী থেকে এস.এস.সি পর্যন্ত পড়েন।

**সৌভাগ্যের সোপান : হযরত থানবী'র সাক্ষাৎ লাভ**

অষ্টম শ্রেণী পড়াকালীন হযরত থানবী রহ.-এর 'যিমানুল ফিরদাউস' গ্রন্থটি তার হাতে আসে। এক বৈঠকেই শেষ করলেন। মর্ম হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। তাই কিতাবটি অনুবাদ করে ফেললেন। নাম দিলেন 'ফিরদাউসের পথে'। এটিই তার প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ।

একদিন জানতে পারলেন, হযরত থানবী রহ. আরাকানের রেঙ্গুন সফরে যাচ্ছেন। কলকাতায় কয়েক দিনের যাত্রা বিরতি করবেন। কীভাবে দেখা করবেন, কী বলবেন? ভেবে পেরেশান।

হযরত এলেন। ভক্তবৃন্দের ঢল। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে একটু মুসাফাহার জন্য। সদর সাহেবও এলেন। সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচল থাকার দু'আ চাইলেন। উম্মতের রূহানী ডাক্তার হযরত থানবী রহ. রোগ নির্ণয় করতে পারলেন। আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখলেন। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী পড়ো? তাহলে মাদরাসায় পড়ো না কেন? অবস্থা জেনে তিনি আফসোস করলেন এবং মাথায় হাত রেখে দু'আ করলেন। সমবেদনা জানালেন।

অস্থির শামসুল হক ফরিদপুরী আরো ব্যাকুল হয়ে পড়লেন থানাভবনে যাওয়ার জন্য। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল নিশ্চিত করার জন্য তিন মাস আগ থেকে সব বইপত্র বেঁধে রাখলেন। শুধু থানবী রহ. এর কিতাবাদি পড়ে সময় পার করলেন। পরীক্ষা শুরু হলো। এক ঘণ্টার পূর্বে খাতা জমা নেয় না। তাই কোন রকম এক ঘণ্টায় যা হয় লিখে বেরিয়ে এলেন। শিক্ষকগণ মনে করলেন নিশ্চয় তার মতিভ্রম ঘটেছে। রেজাল্ট বের হলো। শামসুল হক ফরিদপুরী স্টারমার্কসহ পাঁচ বিষয়ে লেটার পেয়েছেন।

**পিতার আদেশ শিরোধার্য; মায়ের সাথে দেখা হলো না**

ফলাফলের খবর শুনে পিতার নির্দেশ– কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হও। সদর সাহেবের ইচ্ছা গড়িমসি করে ভর্তির নির্দিষ্ট সময় পার করা। তারপর এক বছরের জন্য হলেও দীনী ইলম শিক্ষায় রত হওয়া। ভর্তির মাত্র পাঁচ দিন বাকি থাকতে সদর সাহেব উল্টো বাড়ির পথ ধরলেন। খুলনা পর্যন্ত ট্রেনে এসে জাহাজে চড়লেন। সকালে জাহাজ এসে ভিড়ল বাড়ির পাশে পাটগাতি হাটে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছেন। খোদার কি মহিমা! কাকতালীয়ভাবে সামনে দণ্ডায়মান পিতা আব্দুল্লাহ। চোখ যেন ছানাবড়া। পিতার প্রথম জিজ্ঞাসা– ভর্তি হয়েছো? মাথা নত করে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, না, টাকা নিতে এসেছি, বাড়ি থেকে গিয়ে ভর্তি হবো। কী সর্বনাশ! এত দিনে তো ভর্তির সময় পার হয়ে যাবে। একটু পরেই খুলনাগামী জাহাজ আসবে। সোজা ফিরে যাও। ভর্তি হয়ে পরে এসো। পিতার কড়া নির্দেশ। এতদিন পরে দেশে এসেছেন। এক দৌড় দিলেই মমতাময়ী মায়ের মুখটি দেখে আসা যায়।

বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেলো কিশোর শামসুল হকের আপাদমস্তক। মনের অব্যক্ত ভাব আর ভাবনা অশ্রুর অবয়বে কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মায়ের মুখ আর দেখা হলো না। ফিরে গেলেন কলকাতা পানে। কেননা পিতার আদেশের অবাধ্যাচরণ করার সুযোগ নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজ বলে কথা! মন্ত্রী-এম.পির সুপারিশ নিয়েও অনেকে ভর্তি হতে পারে না। কিন্তু সদর সাহেবের মনে কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রতি চরম অনীহা। এদিকে পিতার নির্দেশ। কী করা যায় ভাবছেন। রাস্তায় কুঁড়িয়ে পেলেন সাদা কাগজী লবণের ঠোঙ্গা। তাতেই দরখাস্ত লিখে জমা দিলেন। এই দরখাস্ত সকলের হাসির খোরাক হলো। কিন্তু সুন্দর হস্তাক্ষর, ইংরেজি বর্ণনাশৈলী আর এইচ.এস.সির রেজাল্ট দেখে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব এই পাগলামীর মূল্যায়ন করলেন।

**শেরে খোদার গর্জনে কুপোকাত শেরে-বাংলা**

কলেজ কর্তৃপক্ষের দাওয়াতে এসেছেন যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী বাংলার বাঘ খ্যাত এ.কে. ফজলুল হক। সেমিনারে বক্তৃতা করছেন উপমহাদেশের রাজনীতির কিংবদন্তি বাংলার গৌরব শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। দর্শক সারিতে বসে আছেন ইসলামী রেনেসাঁর প্রবাদ পুরুষ শেরে খোদা কিশোর শামসুল হক ফরিদপুরী। উভয়ের জন্মস্থানও কাছাকাছি– নদীর এপার ওপার। গোপালগঞ্জ-বরিশাল। শেরে বাংলার ভাষণ যেন অগ্নিশিখা। থামছে না; চলছেই। এদিকে নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। সটান দাঁড়িয়ে গেলেন শেরে খোদা শামসুল হক ফরিদপুরী। দৃঢ় তার কণ্ঠ। It is time of Preyer. Please, Let us now Pray to Allah the Almighty. 'এখন নামাযের সময়, আসুন! আগে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর হুকুম নামায আদায় করি।' হতবাক প্রধানমন্ত্রী। শেরে বাংলার কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেলো। নামাযের বিরতি দিলেন।

কর্তৃপক্ষ চটে গেলো। কেউ কেউ 'মোল্লা' বলে গালি দিলো। তিনি বিস্মিত হলেন। নামাযের কথা বলায় আমি মোল্লা বনে গেলাম। সেই থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, তাহলে আমি মোল্লাই হবো।

**পিতার সম্মতি আর মায়ের দু'আয় সিক্ত হয়ে হেরার আলোর সন্ধানে**

সদর সাহেব একদিন স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে দেওবন্দ যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। ১৯২১ সন। শুরু হলো মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ইংরেজ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলো। ফরিদপুরী রহ. বাড়িতে চলে এলেন। স্নেহময়ী মা'কে জানালেন– আমি দেওবন্দে পড়তে যাবো। পরিস্থিতি ভেবে পিতাও অনুমতি দিলেন। মায়ের দেয়া মাত্র পাঁচ টাকা আর হৃদয় নিংড়ানো দু'আ সম্বল করে বেরিয়ে পড়লেন।

পায়ে হেঁটে খুলনা। তারপর ট্রেনে কলকাতা, সাহারানপুর হয়ে দেওবন্দ গিয়ে পৌঁছলেন। তখন বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। দু'মাস মাদরাসা ছুটি থাকবে। তাই ছুটলেন থানাভবনে। দু'মাস বিশ দিন হাকীমুল উম্মতের সাহচার্যে কাটিয়ে যেন এক দীপ্ত প্রদীপ জ্বলে উঠলো তার হৃদয়ে। হযরত থানবীর পরামর্শে সাহারানপুরে কাফিয়া জামাআতে ভর্তি হলেন। সেখানে নিচের দিকের পড়াশোনা ভালো হয়। সহপাঠী হিসেবে পেলেন সৌন্দর্য আর সুষমায় ভরা এক সুপুরুষ, শান্ত সমাহিত মন, বিনয়-নম্রতায় মোড়ানো যার আচরণ-উচ্চারণ, অনুপম যার কণ্ঠের মাধুর্য, বাংলার আরেক সূর্যসন্তান হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ.-কে। মেশকাত পর্যন্ত দু'জনে একত্রে পড়েন।

**পরশপাথরের ছোঁয়ায়**

কলেজ জীবনের যে তারুণ্য মানুষকে বিপথগামী করে, হযরত থানবীর হাতের ছোঁয়ায় সেই তারুণ্য সদর সাহেবের মাঝে হেরার রাজতোরণ দেখার স্বপ্ন জাগিয়েছে। তাই হযরত থানবী রহ. ছিলেন তার ধ্যান-জ্ঞানের মধ্যমণি। বৃহস্পতিবার এলেই তিনি সাহারানপুর থেকে ৩৫ মাইল (৫৬ কি.মি.) পথ পায়ে হেঁটে থানাভবন যেতেন। জুমু'আর নামায আদায় করে বিদায় নিয়ে ফিরে আসতেন। শুরুতে একাকীই যাতায়াত করতেন। পরে সহযাত্রী হিসেবে পেলেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-কে। সাহারানপুরের চার বছরে সদর সাহেব হুযূর ২০৮ বার থানাভবনে গিয়েছেন এবং প্রায় সাড়ে এগারো হাজার কি.মি. পথ পায়ে হেঁটেছেন!

দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হলেন স্বপ্নের দারুল উলূম দেওবন্দে। এক বছরের নেসাবকে তিনি দু'-বছরে ভাগ করে পড়লেন। এ দু' বছরও তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার ১৮ মাইল (২৯ কি.মি. পথ পায়ে হেঁটে থানাভবন যাতায়াত করতেন।

**সম্বল তার শুকনো রুটি**

১৯২৭ সনের কথা। নোয়াখালী জেলার বটতলী মাদরাসার মুহতামিম, থানবী রহ.-এর খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব রহ. যিনি 'জনাবওয়ালা হুযূর' নামে প্রসিদ্ধ, তিনি থানাভবনের খানকায় ছিলেন। একদিন মসজিদের ছাদে মৃদু ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ অনুভব করলেন। অনুসন্ধিৎসু মনে এর রহস্য উদ্ঘাটনের মানসে তিনি ছাদে উঠলেন। দেখেন এক যুবক লোহার মতো শক্ত রুটি ইট দিয়ে গুঁড়ো করছে। এগুলো সে পানিতে ভিজিয়ে ক্ষুধা নিবরাণ করবে। জনাবওয়ালা হুযূর তার খাবারের ব্যবস্থা করতে চাইলে সে কিছুতেই রাজি হলো না। তিনি ছিলেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.।

মোমেনশাহী বড় মসজিদের ইমাম বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ফয়যুর রহমান সাহেব রহ. বলেন, দেওবন্দে পড়ার সময় আমি এক মসজিদের ইমাম ছিলাম। একদিন শামসুল হক ফরিদপুরী দেওবন্দ থেকে থানাভবনে যাওয়ার পথে আমার মসজিদে উপস্থিত হলেন। নামায শেষে আর তাকে খুঁজে পেলাম না। কোথাও নেই। অবশেষে মসজিদের ছাদে উঠলাম। দেখলাম দেওবন্দের বোর্ডিংয়ের রুটির কিছু সঞ্চিত অংশ রোদে শুকাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, থানাভবনে গিয়ে পানিতে ভিজিয়ে নরম করে খেয়ে নিবেন। না আছে সাথে কোন তরকারী, না আছে কোন মিষ্টান্ন। এমনকি লবণটুকুও নেই। আমার খানায় শরীক হতে বললাম। রাজি হলেন না। আমি বললাম, এত কষ্ট করেন! থানবী রহ.-কে জানালে তো তিনিই সুব্যবস্থা করে দিতেন। দীর্ঘশ্বাস নিয়ে উত্তর দিলেন, কষ্ট ছাড়া দিলে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হয় না এবং মা'রিফাতের কদর হয় না।

**ধ্যান-তাপস আত্মমগ্ন এক মহান সাধক**

আড়াই হাত চওড়া আর কয়েক হাত লম্বা একটি ছোট্ট কামরা। দারুল উলূম দেওবন্দে কবরের কামরা বলে পরিচিত। এখানে কিতাবের পাতায় আত্মহারা হয়ে থাকেন বাংলার গৌরব শামসুল হক ফরিদপুরী। নোয়াখালীর জনাবওয়ালা হুযূর একবার দেওবন্দে গেলেন। দেখলেন, ফরিদপুরীর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। ইচ্ছা করলেন বাংলার এই অমূল্য রতনকে একনজর দেখে যাই। ভিতরে গিয়ে উঁকি দিলেন। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে তার জ্ঞান-সাধনা উপভোগ করলেন। চারপাশের কোন খবর নেই। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং তিনি আর কথা বলে তার একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন না।

**আত্মার পরিশীলন : রূহানী ডাক্তারের নূরানী চিকিৎসা**

হযরত সদর সাহেব রহ. প্রতি রমাযানে থানবী রহ.-এর সোহবতে থাকতেন।

এক রমাযানে হযরত হাফেজ্জী হুযূরও সেখানে ছিলেন। থানবী রহ. পার্শ্ববর্তী মহল্লায় বৃদ্ধ লোকদের জন্য সূরা তারাবীহর ব্যবস্থা করলেন। ইমাম নির্ধারণ করলেন হাফেজ্জী হুযূরকে। সদর সাহেব হুযূরও সেই জামাআতে শরীক হতেন। উভয়েই ছিলেন কুরআনের আশেক। তাই সদর সাহেব বললেন, যেহেতু শাইখের নির্দেশ তাই সূরা তারাবীহই পড়তে হবে, তবে বড় বড় সূরা দিয়ে পড়া হোক। হাফেজ্জী হুযূর তাই করলেন। এতে খতম তারাবীহর চেয়ে বেশি সময় লেগে গেলো। বৃদ্ধ লোকেরা এসে বিচার দিলো থানবী রহ.-এর দরবারে। উম্মতের রূহানী ডাক্তার রোগ নির্ণয় করলেন। খোদরায়ী বা আত্মপ্রসাদ রোগের অভিনব চিকিৎসাপত্র দিলেন।

পৌষ মাস। হাড় কাঁপানো শীতের রাত। নির্দেশ দিলেন দু'জন নির্জন কবরস্থানে গিয়ে খতম তারাবীহ পড়বে। সেখানে রাত কাটাবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত (অনির্দিষ্টকাল) সেখানেই অবস্থান করবে।

মুরশিদের নির্দেশ। ডানে বামে তাকানোর সুযোগ নেই। ইফতার করে দু'জন রওয়ানা হলেন। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, নিঝুম, নিস্তব্ধ। ভয়ে আর শীতে একাকার হয়ে শরীর কাঁপছে। কবরস্থানে পৌঁছে তারাবীহ শুরু করলেন। মনে অজানা আতঙ্ক। নামায শেষে কোথায় যাবেন, কোথায় ঘুমাবেন, সাহরীতে কী খাবেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এদিকে থানবী রহ. কয়েকজনকে পাঠালেন লেপ-তোষক আর গরম খাবার দিয়ে। বললেন, পরিচয় গোপন রেখে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে। এভাবে কয়েক রাত খোলা আকাশের নিচে কাটালেন। পরে আম্মা হযরত জানতে পেরে দয়ার্দ্র হয়ে জোরালো সুপারিশ করলেন। অবশেষে তারা এই কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পেলেন। এভাবে হাকীমুল উম্মতের হাতে নিজের আত্মার চিকিৎসা করিয়ে উৎকর্ষ সাধন করেছেন। এ ব্যাপারে খোদ হযরত সদর সাহেব রহ. লিখেন, হযরত থানবী রহ. আমার কোন শিরা-উপশিরা, কোন লোমকূপ বাকি রাখেননি; সর্বত্র অপারেশন করেছেন। জীবনভর নিজেকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করেছি। শুধু ইসলাহের ভিখারী হয়ে তার দরবারে পড়ে থেকেছি। ইসলাহ হয়ে গেছে এমন ধারণা এক মুহূর্তের জন্যও হৃদয়কোণে আসতে দিইনি। খেলাফতের চিন্তা কোন দিনই মনে আসেনি। কোন দিনই এ চিন্তার প্রশ্রয় মনে দিইনি।

**গুরুভক্তি ও উস্তাদের শ্রদ্ধাভাজন ছাত্র**

হযরত সদর সাহেব রহ. উস্তাদদের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত ছিলেন। নিজে কখনো এমন কোন আচরণ করেননি যাতে কোন উস্তাদ কষ্ট পান। আবার উস্তাদদের ব্যাপারে অন্য কেউ এ জাতীয় আচরণ করলে তিনি তা বরদাশত করতেন না; সাথে সাথে প্রতিবাদ করতেন। কেননা তিনি ছিলেন হযরত থানবী রহ.-এর চিন্তা-চেতনার আদর্শ-মানব। আর থানবী রহ.-এর উসূল হচ্ছে, তোমার সামনে যদি কেউ কোন উস্তাদের বদনাম করে, যদি উস্তাদ সে কাজ করেও থাকেন তথাপি তোমার কর্তব্য হলো, এর প্রতিবাদ করা। তা সম্ভব না হলে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে আসা। তাই হযরত সদর সাহেব রহ. ছিলেন এর বাস্তব নমুনা।

**ছাত্র জীবনের কথা :** সদর সাহেব যখন দারুল উলূম দেওবন্দে দাওরা পড়েন। সে বছর হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. দেওবন্দ ছেড়ে ডাবেল চলে যান। প্রতিবাদে দাওরার ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় শুয়ে পড়লো। কোন উস্তাদকে দরসে আসতে দিবে না। কয়েকদিন এ অবস্থা চললো। সদর সাহেব এ কাজ সমর্থন করলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন, যদি একজন উস্তাদও সবক পড়াতে আসেন, তাহলে আমাকে শহীদ করা হলেও আমি উস্তাদের সম্মানার্থে দরসগাহের দিকে অগ্রসর হবো।

**শাইখুল ইসলামের আশাবাদ : দেওবন্দের জন্য একটি ছেলেই যথেষ্ট**

হযরত মাদানী রহ. কয়েকদিন যাবত ছাত্রদের এই কাণ্ড-কারখানা পর্যবেক্ষণ করলেন। একদিন সবাইকে মসজিদে সমবেত করে জলদগম্ভীর কণ্ঠে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল থেকে সবক চলবে, মন না চাইলে তোমরা সব চলে যেতে পারো। আমার একটি ছেলে আছে 'শামসুল হক'। কেউ না গেলে সে একা অবশ্যই সবকে বসবে। আমি তাকে পড়াবো। এই একটি ছেলেই দারুল উলূমের জন্য যথেষ্ট।

**রাজনৈতিক জীবনের কথা :** পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিমলীগের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিলো হযরত থানবী রহ.-এর। অপরদিকে পাকিস্তান আন্দোলনের বিপক্ষে অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা ছিলেন হযরত মাদানী রহ.। যে কারণে মুসলিমলীগ নেতাদের বাঁকা নজর ছিলো হযরত মাদানী রহ.-এর প্রতি। ১৯৪০ সনের শেষ দিকের কথা। মুসলিমলীগের এক জনসভা ছিলো সিরাজগঞ্জে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম-লীগের তৎকালীন ছাত্রনেতা শাহ আজিজুর রহমান (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রী) বক্তৃতা করতে গিয়ে হযরত মাদানী রহ.-কে নিয়ে কটূক্তি করে বসলো। সাথে সাথে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন সদর সাহেব হুযূর রহ.। শাহ আজিজের সামনে থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে বজ্রহুঙ্কার ছাড়লেন, বক্তব্য যদি প্রত্যাহার না করা হয়, তাহলে আমরা এখান থেকে চলে যাবো। মুসলিমলীগ থেকে আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিবো। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বক্তব্য প্রত্যাহার করালেন। সদর সাহেব বললেন, শাইখুল ইসলাম মাদানী রহ. আমার বুখারীর উস্তাদ। তিনি তার জ্ঞান-বিবেক অনুযায়ী পাকিস্তান আলাদা করাকে ভারতের মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন। আর আমরা জরুরী মনে করেছি। চিন্তার ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু তার দীনদারী ও বুযুর্গী সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধাশীল।

**অনুশোচনায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন**

সদর সাহেব তখন সাহারানপুরে কুদূরী জামাআতে পড়েন। কুদূরী কিতাব যে উস্তাদ পড়ান তার চেয়েও আরো রুচিশীল অন্য উস্তাদের কাছে পড়ার আবেদন করে কিছু ছাত্র দরখাস্ত লিখলো। মুহতামিম মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. তাদের ডেকে বললেন, উপযুক্ত ব্যক্তিকেই পড়াতে দেয়া হয়েছে। অতএব পরিবর্তন করা যাবে না। নিরাশ হয়ে ছাত্ররা ফিরে এলো।

শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. চিন্তায় পড়ে গেলেন। নিশ্চয় ব্যাপারটি উস্তাদের কানে পৌঁছবে। তারপরে কীভাবে তাকে মুখ দেখাবো। তার সামনে কেমনে সবকে বসবো। দুশ্চিন্তা আর অনুশোচনা তীব্রতর হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মাথায় পানি ঢেলে হুঁশ ফেরানো হলো। কিন্তু সেই একই কথা– আমি কীভাবে উস্তাদের সামনে মুখ দেখাবো। তিনি আমাকে কী ভাববেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অন্য ছাত্রদের মাঝে কোন অনুশোচনাবোধ বা দুশ্চিন্তা দেখা গেলো না। এমন সজাগদৃষ্টি ও শ্রদ্ধাবোধের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাকে এতো বড় করেছেন।

**অধ্যাপনায় গভীর মনোযোগী**

হযরত সদর সাহেব রহ. গভীর মনোযোগ সহকারে কিতাব অধ্যয়ন করতেন। গুরুত্বপূর্ণ কিতাব কয়েকবার খতম করতেন। যার ফলে প্রতিটি কিতাব প্রায় মুখস্থ হয়ে যেত। কোন্ আলোচনা কোন্ পৃষ্ঠায় আছে বলে দিতে পারতেন।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বলেছেন, এক রমাযান মাসে সদর সাহেব হুযূর পুরো ফাতহুল কাদীর (হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ) অধ্যয়ন করেন। তারপর থেকে যে কোন মাসআলা পৃষ্ঠা নম্বরসহ বলে দিতেন।

হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. বলেছেন, সদর সাহেব রহ. তাফসীরে হাক্কানী কোন কিতাব সামনে রাখা ছাড়াই মুখস্থ লিখতেন। কোন বিষয়ের তাহকীকের প্রয়োজন হলে বলতেন, দেখো তো অমুক পৃষ্ঠায় আছে কি না? খোঁজ করে আমরা হুবহু ঐ স্থানেই পেতাম।

**দেওবন্দ থেকে বাংলার আকাশে হকের সূর্য**

দেওবন্দে দু'বছরে দাওরা শেষ করলেন। এ সময় দেওবন্দে তিন জায়গা থেকে যোগ্য লোক চেয়ে চিঠি আসলো।

(এক) আফগান বাদশাহ জহির শাহের পররাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী পদে। প্রার্থীকে অবশ্যই আরবী, বাংলা ও ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। বেতন-ভাতাও অনেক।

(দুই) হায়দারাবাদ শরয়ী আদালতে একজন বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হবে। ইসলামী আইন শাস্ত্রের পণ্ডিত, দূরদর্শী একজন দেওবন্দী আলেম প্রয়োজন। বেতন মাসিক ছয়শত টাকা।

(তিন) বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ঐতিহ্যবাহী বাহরুল উলূম মাদরাসায় (বর্তমান নাম জামি'আ ইউনুসিয়া) দাওরায়ে হাদীস খোলা হবে। একজন দক্ষ শাইখুল হাদীস প্রয়োজন। মাসিক বেতন মাত্র ষাট টাকা। সবগুলো পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি সদর সাহেব। তাই উস্তাদগণ তার মতামত জানতে চাইলেন।

পূর্ব বাংলার ইলমী জাগরণের কিংবদন্তি, বাংলার দুর্লভ রত্ন, স্বজাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হযরত সদর সাহেব রহ. ক্ষণকাল চিন্তা করে বিনীত কণ্ঠে আরয করলেন, আমার মন চায় পূর্ব বাংলায় দারুল উলূমের নকশে কদমে মাদরাসা কায়েম করতে। বাংলার জনগণের মাঝে ঈমানী জাগরণ সৃষ্টি করতে। তবে আমি আমার সেরতাজ উস্তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আপনারা যেখানে মুনাসেব মনে করেন আমি সেখানে যেতে প্রস্তুত আছি। তার এই অর্থ-বিমুখতা ও স্বজাতির প্রতি দরদ দেখে সবাই পুলকিত হলেন। হযরত মাদানী রহ. সিদ্ধান্ত দিলেন, তুমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাও। সদর সাহেব বললেন, হুযূর! আমার তো মাসে দশ টাকা হলেই প্রয়োজন পুরা হয়ে যায়, ষাট টাকা দিয়ে আমি কী করবো? বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটছে না। সবাই থমকে গেলেন। মাদানী রহ. বললেন, ঠিক আছে তোমার প্রয়োজন না হয়, অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা আমাকে দিয়ে দিয়ো। আমরা সকলেই বুঝি যে, এটা তো ছিলো শাইখ মাদানীর 'বাত কী বাত' কথার কথা। কিন্তু সদর সাহেব সত্যি সত্যি প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা করে জমিয়ে রেখে রমাযানে ছয়শত টাকা নিয়ে মাদানী রহ. এর হাতে তুলে দিলেন।

দেখতে দেখতে এই দেদীপ্যমান সত্যের রবি আলোকময় করে তুললেন শিরক-বিদ'আতে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলার প্রত্যন্ত জনপদ। দেওবন্দী চেতনা আর থানবী আদর্শের বীজ বপণ করলেন বাংলার উর্বর ভূমিতে। শাখা-প্রশাখা আর ফুলে-ফলে ভরে উঠলো এই শ্যামল বাংলা। সোনার ফসলে যথার্থতা পেলো সোনার বাংলা নামটি। বড় কাটারা, লালবাগ, ফরিদাবাদ, গওহরডাঙ্গা, মোস্তফাগঞ্জ, কমলাপুরসহ বহু দীনী প্রতিষ্ঠান আর হযরত মুহাদ্দিস সাহেব, শাইখুল হাদীস সাহেব, মুফতী আমীনী সাহেব, মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব, মাওলানা আব্দুল হাই বরিশালী, পাহাড়পুরী প্রমুখ মনীষী হযরত সদর সাহেবের অমর কীর্তির রাজসাক্ষী হয়ে আছেন।

**তিনিই যথেষ্ট, আমার আর আসার প্রয়োজন নেই**

সদর সাহেবের বাড়ির অদূরেই মধুমতি নদী। তিনি নদীতে গোসল করতে ভালোবাসেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বাড়িতে এসেছেন। নদীতে গোসল করতে গিয়ে দেখেন ঘাটে লোকজনের জটলা। জানতে পারলেন, নৌকায় করে আসছেন জৈনপুরের পীর সাহেব। পার্শ্ববর্তী গিমাডাঙ্গা গ্রামে ওয়াজ মাহফিলে যাবেন। পালকি নিয়ে সবাই প্রতীক্ষায় আছেন। নৌকা থেকে নামতেই সদর সাহেব হুযূর তাকে সালাম করলেন। অশিক্ষিত নিঝুম পল্লীতে বিশুদ্ধ সালাম শুনে পীর সাহেব চমকে উঠলেন। দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বুঝে নিলেন লোকটি বিজ্ঞ আলেম হবেন। পরিচয় জেনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। এই অজপাড়া গায়ের ছেলে! মাওলানা থানবীর স্নেহধন্য, দেওবন্দের সেরা ছাত্র। জামি'আ ইউনুসিয়ার শাইখুল হাদীস।

পীর সাহেব সভাস্থলে পৌঁছে বিকালে পালকি পাঠিয়ে দিলেন সদর সাহেবকে নেয়ার জন্য। এলাকার লোকেরা বলতে আরম্ভ করলো, 'ঘোপেরডাঙ্গায় আব্দুল্লাহ মুন্সির পোলা। শুনছি কী একটু পড়ালেখা শিখেছে। তারে আবার আমাদের কান্ধে কইরা আনন লাগবো।' তবুও পীর সাহেবের হুকুম তামিল করতে তারা পালকি নিয়ে সদর সাহেবের বাড়িতে গেলেন। হুযূর পালকিতে না চড়ে হেঁটেই চলে এলেন।

পীর সাহেব স্টেজে ওয়াজ করছিলেন। ইতোমধ্যে সদর সাহেব গিয়ে সাধারণ শ্রোতাদের মাঝে বসে পড়লেন। পীর সাহেবের নজর পড়তেই তিনি সদর সাহেবকে স্টেজে ডেকে এনে পাশের চেয়ারে বসালেন। এবার বর্ষীয়ান মুরব্বীদের টনক নড়ে উঠলো। পীর সাহেব দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'হে আমার বাংলার দীনী ভায়েরা! শুনে রাখো, তোমাদের এই বাংলার পূর্ব দিগন্তে শামসুল হক ফরিদপুরী নামে হকের যে সূর্য উদিত হয়েছে, এদেশের মানুষের হিদায়াতের জন্য তিনিই যথেষ্ট। আমার আর আসার প্রয়োজন নেই; তোমরা তার কথা মেনে চলবে।

**রত্নভাণ্ডার জামি'আ ইউনুসিয়া**

থানাভবনের খানকায় একত্রে ছিলেন বাংলার তিন সূর্যসন্তান– সদর সাহেব, হাফেজ্জী হুযূর ও পীরজী হুযূর। ছাত্রাবস্থায় তারা তিনজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, দেশে ফিরে সর্বদা একত্রে দীনের খিদমত করবেন। কোন তালিবে ইলম পেলে পড়াবেন; অন্যথায় নিজেরাই পরস্পরে চর্চা করবেন। আহ! সেকি মায়ার বাঁধন। সেই স্মৃতি হৃদয়পটে ভেসে উঠলেই সদর সাহেব অস্থির হয়ে পড়েন। নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হয়। এদিকে হাফেজ্জী হুযূর এবং পীরজী হুযূরও দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল। সদর সাহেব হুযূর জামি'আ ইউনুসিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে হাফেজ্জী হুযূর ও পীরজী হুযূরকে ইউনুসিয়ায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে থানাভবনে পত্র প্রেরণ করলেন। থানবী রহ.-এর দু'আ নিয়ে দেশে ফিরে তারা উভয়ে যোগদান করলেন জামি'আ ইউনুসিয়ায়। আহ! সেকি আনন্দ! সেকি মনোরম

দৃশ্য। বাংলার হিরে-মতি-পান্না ত্রিরত্নের মিলনমেলা। থানবী চেতনায় উজ্জীবিত অদম্য স্পৃহা আর প্রতিজ্ঞায় তাদের মন টইটম্বুর। বিস্ময়কর তারুণ্যে ভরপুর তাদের দেহের প্রতিটি কোষ। অবিরাম প্রয়াস, কীভাবে দিশেহারা বাংলার মানুষকে হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে এনে দাঁড় করানো যায়। শিক্ষা পদ্ধতিতে কীভাবে নতুন ধারার আয়োজন করা যায়। ফলে দেখতে দেখতে মাদরাসার সার্বিক অবস্থায় অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিলো। প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো জামি‘আ ইউনুসিয়া।

**বিদায় জামি‘আ ইউনুসিয়া**

পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলো। কোন কারণে তিন বন্ধু জামি‘আ ইউনুসিয়া ত্যাগ করলেন। সদর সাহেবের পূর্ব পরিচিত এক বৃদ্ধের অনুরোধে চলে এলেন বাগেরহাটের গজালিয়ায়। সাথে অনেক ছাত্রও চলে এলো। শুরুতেই দাওরা পর্যন্ত খোলা হলো। সাগর তীরের জনপদ। পানি লবণাক্ত। আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর। অনেকেই অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। বছর শেষে পরামর্শ করলেন– দেশব্যাপী কাজ করতে হলে কেন্দ্রীয় শহর ঢাকাতেই মাদরাসা করতে হবে। হিদায়াতের দীপ্ত আলো বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে এই নূরানী কাফেলা ঢাকায় চলে এলেন। **(আগামী সখ্যায় সমাপ্য)**

**লেখক : শিক্ষক, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।**

**(৪০ পৃষ্ঠার পর; ইসলামের ইতিহাস)**

এ কারণে কুরাইশরা নবীজীকে হত্যার পথে না গিয়ে সমঝোতা ও সন্ধির পথ বেছে নিলো। এক্ষেত্রে তারা নবীজীর অভিভাবক চাচা আবূ তালেবের নিকটে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলো।

**কুরাইশ নেতৃবৃন্দের আবু তালেবের নিকট গমন**

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রকাশ্যে কাফেরদের মা‘বুদ তথা মূর্তির নিন্দা করতে লাগলেন এবং লোকদেরকে ইসলামের দিকে ডাকতে লাগলেন, তখন কাফেররা প্রথমত নবীজীর চাচা আবূ তালেবের কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলো। চাচা আবূ তালেব তাদেরকে বুঝিয়ে এবারের মত শান্ত করলেন।

এরপর যখন নবীজীর দাওয়াত আরো জোরেশোরে চলতে লাগলো, তখন দ্বিতীয়বারের মত কুরাইশ কাফেররা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে নবীজীর চাচার কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলো। এ পর্যায়ে তারা নবীজী তাদের উপাস্যদের সমালোচনা থেকে বিরত না হলে বনু হাশেমের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ারও হুমকি দিলো। চাচা আবূ তালেব নবীজীকে ডেকে কুরাইশদের উপাস্যদের নিন্দা করা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু যে দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব দিয়ে নবীজীকে পাঠানো হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকা কোনোভাবেই নবীজীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এ কারণেই নবীজী অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,

يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه

‘হে চাচা! যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হতে চন্দ্র রেখে দেওয়া হয়, তবুও আমি এ দায়িত্ব পরিত্যাগ করবো না। যতক্ষণ না আল্লাহ তা‘আলা তা বিজয়ী করবেন অথবা আমি তার অন্বেষায় প্রাণ বিসর্জন দেবো!’

নবীজীর এ দৃঢ়তা দেখে চাচা আবূ তালেব নবীজীকে আশ্বস্ত করে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে নিরত থাক। তুমি যা ভালো মনে করো, তাই করো। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তোমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করবো না!’

আল্লাহর মহিমা যে, সমগ্র আরবের বিরোধিতার পাশাপাশি নিজে কাফের হওয়া সত্ত্বেও চাচা আবূ তালেব নবীজীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে কখনো নিরুৎসাহিত কিংবা ভীত হননি। বরং মৃত্যু পর্যন্ত ভাতিজাকে নিজ স্নেহ ও নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে রেখেছেন..! (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৯২, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৪৫)

**সমঝোতার ভিন্ন প্রচেষ্টা**

ভয়ভীতির মাধ্যমে যখন নবীজীকে কিংবা চাচা আবূ তালেবকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হলো না; তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরামর্শ করে যাদুবিদ্যা, গণনাবিদ্যা এবং কবিতাবিদ্যায় সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি উতবা ইবনে রবীআকে নবীজীর সাথে কথা বলার জন্য পাঠালো। উতবা ইবনে রবীআ নবীজীকে প্রস্তাব দিয়ে বললো, ‘যদি তোমার সম্পদের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে তোমার জন্য এত সম্পদ জমা করবো যে, তুমি কুরাইশদের মধ্যে সর্বাধিক ধনী হয়ে যাবে। যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সম্মান, তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেব এমনভাবে যে, তোমার অভিমত ছাড়া আমরা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবো না। আর যতি তুমি বাদশাহ হতে চাও, তবে আমরা তোমাকে (সমগ্র আরবের) বাদশাহ বানিয়ে নেবো। আর যদি ব্যাপারটি জীনের প্রভাবে হয়ে থাকে, তবে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো এবং যত সম্পদ প্রয়োজন, ব্যয় করে তোমাকে সুস্থ করে তুলবো।’[১]

এ কথার জবাবে নবীজী তাকে সূরা হা-মীম সাজদার প্রথম **১৩** টি আয়াত পড়ে শোনালেন। উতবা এ আয়াত শুনে কুরাইশদের নিকটে ফিরে গিয়ে বললো, ‘আল্লাহর শপথ! আমি এমন বাণী শুনেছি, যা কখনো শুনিনি। এ বাণী কবিতা কিংবা গণকের কথা নয়। হে কুরাইশ! আমার কথা শোন! তাকে তার মত থাকতে দাও। খোদার কসম! যে কথা আমি শুনেছি, তা মহান সংবাদ! যদি সমগ্র আরব তার উপর বিজয় লাভ করে, তবে তোমরা এমনিতেই বিজয়ী হলে। আর যদি সে আরবের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার বিজয় তোমাদেরই বিজয়। তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান। তার মাধ্যমেই তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে...।’ কুরাইশরা এ কথা শুনে খোদ উতবাকে যাদুগ্রস্ত সাব্যস্ত করলো..! (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা.নং ৯৮২৪ : قال الهيثمى : رواه أبو يعلى، وفيه الأجلح الكندي، وثقه ابن معين، وغيره، وضعفه النسائي، وغيره، وبقية رجاله ثقات, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৬৮-৬৯, আস-সীরাতুন নববিয়্যা ১৯৫)

ভয়-ভীতি আর লোভ-লালসা কোনোভাবেই যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হলো না; তখন তারা নবীজীর উপর এবং অন্যান্য মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। কেননা, জুলুম-নির্যাতনই ছিলো তাদের সর্বশেষ উপায়। ফলে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের জন্য নিজ মাতৃভূমিতে দীন ও ঈমানের উপর টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। ফলে রচিত হলো দীনের খাতিরে মাতৃভূমি ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ‘হাবশা অভিমুখে হিজরত’! **(চলবে ইনশাআল্লাহ)**

**লেখক: শিক্ষক, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭**

১. কোনো কোনো বর্ণনায় এটাও আছে যে, উতবা নবীজীকে এ প্রস্তাব দেয় যে, ‘যদি তোমার বিবাহের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে কুরাইশদের সর্বাধিক সুন্দরী মহিলাকে পছন্দ করে নাও, আমরা তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দেব।’ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ; ৯৮২৪

قال الهيثمى : رواه أبو يعلى، وفيه الأجلح الكندي، وثقه ابن معين، وغيره، وضعفه النسائي، وغيره، وبقية رجاله ثقات

হজ্জের জরুরী মাসাইল

# হাজী মহিলার পর্দার বিধান


## মাওলানা মাকসূদুর রহমান মুমিনপুরী


হজ্জ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। প্রচুর অর্থ, কষ্ট ও সময় ব্যয় করে এ ইবাদত পালন করা হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ ইবাদতের ঈর্ষণীয় পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, জান্নাতই হবে মাবরূর হজ্জের একমাত্র পুরস্কার। পুরস্কার যেমন বড়, তা লাভ করতে হলে হজ্জও হতে হবে তেমন নিখুঁত। হজ্জের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সকল বিধান যখন যথাযথ পালন করা হবে তখনই কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার লাভের আশা করা যাবে। হজ্জের সফরে কিছু শরয়ী বিধানে ভুল বোঝাবুঝি লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে হাজী মহিলার পর্দা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভুল মাসআলা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে অনেক মহিলা হজ্জের সফরে পর্দা ছেড়ে দেয়। চেহারা, হাত, পা সব উন্মুক্ত রেখে এই পবিত্র সফর সম্পন্ন করে। এতে একদিকে ঐ মহিলার পর্দা ছেড়ে দেয়ার গুনাহ হতে থাকে, অপরদিকে গাইরে মাহরাম পুরুষগণ ব্যাপকভাবে চোখের গুনাহে লিপ্ত হয়। গুনাহ হারামের পবিত্র ভূমিতে হওয়ায় এর মাত্রাও বহুগুণ বেড়ে যায়। গুনাহের তীব্রতায় অর্থ, কষ্ট ও সময় সবই বিফলে যায়। এজন্য হাজী মহিলাদের পর্দা সংক্রান্ত মাসআলার ব্যাপারে সচেতন থাকা খুব জরুরী। বক্ষ্যমান নিবন্ধে মহিলাদের ইহরাম সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর চেহারা ও হাত-পায়ের পর্দা বিষয়ক দালীলিক আলোচনা পেশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

**মহিলার ইহরাম**

মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করতে পারবে। রঙিন পোশাক এবং বাড়িতে ব্যবহৃত সাধারণ পোশাক পরিধান করতে পারবে। কালো বোরকা ব্যবহার করতে পারবে; সাদা পোশাক পরা জরুরী নয়। পরপুরুষের সামনে বা বাইরে বের হতে হলে চেহারা ও হাত-পায়ের পর্দা করতে হবে। কিন্তু মুখমণ্ডলে কাপড় লাগানো যাবে না। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে অ্যাক্সিডেন্ট বা বড় ধরণের কোন ক্ষতির আশঙ্কা হলে প্রয়োজনীয় সময়টুকুতে চেহারার কাপড় সরিয়ে ফেলতে পারবে। হাত মোজা ও পা মোজাও পরিধান করতে পারবে। মহিলাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়ও সাধারণ সময়ের মতো পর্দার বিধান বহাল থাকবে।

**এক. ইহরাম অবস্থায় চেহারার পর্দা**

মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় চেহারার সাথে মিলিয়ে কোন কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না। চেহারায় কোন কাপড় বাঁধতেও পারবে না। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারার পর্দা করার পদ্ধতি হল, তারা ক্যাপ বা এ জাতীয় কিছু মাথায় রেখে সেটার উপর থেকে চেহারায় কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। এ কাপড় চেহারা থেকে পৃথক থাকবে; চেহারার লেপ্টে থাকবে না। তবে বাতাসে কোন অংশ লেগে গেলে কোন অসুবিধা নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় যদি চেহারা ঢাকতে চায়, তাহলে মাথার ওড়নার উপর দিয়ে চেহারার উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিবে এবং কাপড়টি চেহারা থেকে পৃথক রাখবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও আমাদের ফুকাহাদের মত এটিই। (মুআত্তা মুহাম্মাদ; হা.নং ৪২৪)

আরবী পাঠ–

فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلا من فوق خمارها على وجهها وتجافيه عن وجهها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

মাবসূত গ্রন্থের মতন (মূলপাঠ) 'আল-কাফী'-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাথার উপর দিক থেকে কাপড় যদি এমনভাবে ঝুলিয়ে দেয় যে, কাপড় চেহারায় মিশে থাকে না, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। (কিতাবুল মাবসূত ২/৪, পৃষ্ঠা ১৪১)

ولا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها.

ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি পর্দার জন্য মাথার উপর দিক থেকে চাদর ঝুলিয়ে দেয়ার কথা বলতেন। (আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/৪৬৩)

قلت وكذلك المرءة اذا غطت وجهها؟ قال: نعم، إلا ان مالكا كان ان تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها اذا اردت سترا، فان كانت لا تريد سترا فالتسدل.

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, মহিলাগণ চেহারা ওড়না দ্বারা মোড়াবে না, তবে মাথা ঢেকে রাখবে। যখন চেহারা ঢাকতে চাইবে, ওড়না পৃথক করে নিবে। অতঃপর চেহারা থেকে দূরত্ব রেখে কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। (কিতাবুল উম্ম ৩/৫৭১)

ولا تخمر وجهها، ولا تخمر رأسها إلا أن تريد ان تستر وجهها فتجافى الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.

আল্লামা ইবনে কুদামা আল-মুগনীতে উদ্ধৃত করেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, মহিলাগণ মাথার দিক থেকে চেহারার উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। নিচের দিক থেকে কাপড় উপরের দিকে উঠিয়ে চেহারা আবৃত করা যাবে না। সম্ভবত তার মতে নেকাব হলো, যা নিচের দিক থেকে উঠিয়ে চেহারায় বাঁধা হয় (উপর দিক থেকে নামানো হয় না)। (আল-মুগনী ৫/১৫৪)

قال أحمد: انما لها ان تسدل على وجهها من فوق وليس لها ان ترفع الثوب من اسفل، كأنه يقول: ان النقاب من اسفل على وجهها.

ইমাম খাত্তাবী রহ. বলেন, যারা এ মতের প্রবক্তা যে, মহিলাগণ মাথার দিক থেকে চেহারার উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিবে, তাদের কয়েকজন হলেন, আতা, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসানের মতও এটি।... (মা'আলিমুস সুনান ১/২, পৃষ্ঠা ১৫৪)

وممن قال بان للمرءة ان تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري واحمد بن حنبل واسحاق وهو قول محمد بن الحسن وقد علق الشافعي القول فيه.

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেছেন, ইহরাম ধারণকারী মহিলার চেহারায় কাপড় ঝুলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

واجمعوا ان لها ان تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال اليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة.

এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পুরুষের নাজায়েয দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ইহরাম ধারণকারী মহিলা চেহারায় আলতোভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। উলামায়ে কেরাম তার চেহারা অবগুণ্ঠিত করার অনুমতি দেননি। (আত-তামহীদ ৬/১৮, আল-ইসতিযকার ৪/১৪, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/২, পৃষ্ঠা ৯২)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. চেহারায় কাপড় ঝুলানোকে বৈধ বলেছেন। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলার চেহারা ঢাকার ব্যাপারে ইমাম আহমদ ও অন্যদের থেকে দু'টি মত বর্ণিত আছে– এক. চেহারা মুহরিম পুরুষের মতো। সুতরাং ঢাকা যাবে না। দুই. চেহারা হস্তদ্বয়ের মতো। সুতরাং ঢাকা যাবে। (মাজমু'আতুল ফাতাওয়া ২২/১২০, ১৪৯, ১৫০)

وفي تغطية وجه المرءة في الاحرام قولان في مذهب احمد وغيره، قيل انه كرأس الرجل فلا تغطي، وقيل انه كيديه فتعطى ... واما تغطية الوجه بما يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها. اهـ

وقال ابن القيم: ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرءة ولا تلبس القفازين يعني في الاحرام، فسوى بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا امرها بكشفه البتة، ونساءه صلى الله عليه وسلم اعلم الامة بهذه المسئلة، وقد كن يسدلن على وجوههن اذا ماذا هن الركبان وقدوري الامام احمد عن خمسة من الصحابة ... (اعلام الموقعين ١٧٠،١٧١/١)

ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, মহিলাদের জন্য বোরকা দ্বারা চেহারা ঢাকা ফরয। তবে হজ্জের মধ্যে তার বিধান ভিন্ন। তখন চেহারার উপর ওড়না এমনভাবে ঝুলিয়ে দিবে, যাতে তা চেহারার সাথে মিলে না থাকে। (আরিযাতুল আহওয়াযী ৪/৫৬)

وذلك لان سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فانها ترضى شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به.

মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ উসাইমিন বলেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলার পাশে যদি গাইরে মাহরাম থাকে তাহলে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এছাড়া চেহারা খোলা রাখবে। (ফিকহুল ইবাদাত; পৃষ্ঠা ৩৫১)

الا اذا كان حولها رجال غير محارم لها، فانه يجب عليها ان تستر الوجه.

**হাদীসে এ বিষয়ে কী আছে**

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। আরোহীগণ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো। অতএব যখন তারা পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো, আমরা আমাদের বড় চাদর মাথার দিক থেকে চেহারায় ঝুলিয়ে দিতাম। অতঃপর যখন তারা চলে যেতো, আমরা চেহারা খুলে দিতাম। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৪০২১, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৮৩৩, মুসনাদে ইবনে খুযাইমা; হা.নং ২৬৯১)

... فاذا جاوزوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها... قال الارنووط: اسناده ضعيف لضعف يزيد وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ ঘাসবিশেষ ও জাফরান দ্বারা রং করা কাপড় ছাড়া যে কোন কাপড় পরিধান করতে পারবে। ... নেকাব দ্বারা ঢাকবে না। তবে চাইলে চেহারার উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতে পারে (যা চেহারায় লেগে থাকবে না)। (আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী; হা.নং ৯০৫০)

... ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.

وهذا اسناد صحيح كما قال شعيب الارنوط.

হযরত ফাতেমা বিনতে মুনযির বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় ওড়না দ্বারা আমাদের চেহারা ঢেকে নিয়েছি এবং তখন আমরা আসমা বিনতে আবূ বকরের সাথে ছিলাম। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ৩৬৩)

ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, আয়েশা রাযি.-এর হাদীসে চেহারা আচ্ছাদিত করার যে পদ্ধতি বলা হয়েছে, এখানে সেটাই উদ্দেশ্য হবে। (আল-ইসতিযকার ৪/১৫; বাবুল গুসলি লিল-ইহরাম)

كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.

ফাতহুল বারী কিতাবে হাফেয ইবনে হাজার রহ. উল্লেখ করেন, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, মহিলাগণ বড় চাদর মাথার দিক থেকে চেহারায় ঝুলিয়ে দিবে।

تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها.

তালখীসুল হাবীর কিতাবে হাফেয ইবনে হাজার রহ. ইসমাঈল ইবনে খালিদের সূত্রে তার মা থেকে বর্ণনা করেন,

كنا ندخل على ام المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا ام المؤمنين! هنا امرأة تأبي ان تغطي وجهها وهي محرمة، فوقعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها.

আমরা ৮ই যিলহজ্জ হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে গেলাম। তাকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! এখানে একজন মহিলা ইহরাম অবস্থায় আছে; সে চেহারা ঢাকতে অস্বীকার করছে। আয়েশা রাযি. ওই মহিলার ওড়না তার শরীর থেকে উঠিয়ে তা দ্বারা তার চেহারা ঢেকে দিলেন। (তালখীসুল হাবীর ৩/৯১১)

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে যখন কাফেলা অতিক্রম করতো তখন আমরা মাথার দিক থেকে চেহারায় কাপড় টেনে দিতাম। (সুনানে দারাকুতনী ২/২৫৮)

فيمر بنا الراكب فتسدل المرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها.

উল্লিখিত আলোচনায় যাদের উদ্ধিত উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশ হলেন মুজতাহিদ উলামায়ে কেরাম। এছাড়া হযরত আয়েশা রাযি., হযরত ফাতেমা বিনতে মুনযির রাযি.-সহ নবীযুগের বিশিষ্ট মহিলা সাহাবীদের বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এসব বর্ণনা যদি কেউ মনোযোগের সাথে পাঠ করেন, স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইহরাম অবস্থায় পরপুরুষ থেকে চেহারার পর্দা করা মহিলাদের জন্য আবশ্যক।

**হাজী মহিলাকে যেসব বর্ণনার আলোকে চেহারায় কাপড় রাখতে নিষেধ করা হয়**

হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, মহিলার ইহরাম তার চেহারায়, পুরুষের ইহরাম তার মাথায়।

احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه اخرجه الدار قطني (٢٧٣٥) اسناده صحيح، واخرجه البيهقي (٩٠٤٨) بهذا الاسناد موقوفا. وقال هكذا رواه الدراوردي وغير موقوفا على ابن عمر ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير.

হযরত ইবনে উমর রাযি. এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ নেকাব পরবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৩৮)

لا تنتقب المرأة المحرمة.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) দাঁড়িয়ে লোকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। এর মধ্যে ইয়ামানের খাসআম গোত্রের এক সুশ্রী মহিলা এসে রাসূলকে প্রশ্ন করতে লাগলো। ফযল ইবনে আব্বাস তাকে দেখছিল এবং মুগ্ধ হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার (ফযল ইবনে আব্বাসের) চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬২২৮)

وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها.

ইবনে আব্বাস রাযি.-এর হাদীসে যুক্তি হলো, চেহারা যদি উন্মুক্ত না হতো তাহলে হাদীসে সৌন্দর্যের বর্ণনা কিভাবে এলো। বুঝা গেলো, চেহারা খোলা ছিলো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য চেহারা খোলা থাকা জরুরী নয়। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল দেয়া ঠিক হবে না। কারণ, এখানে সৌন্দর্যের উল্লেখ থাকলেও চেহারার সৌন্দর্যের উল্লেখ নেই। বোঝা যাচ্ছে, সামগ্রিক বিবেচনায় সৌন্দর্যের বিবরণ এসেছে। তাছাড়া প্রচণ্ড ভিড়ে সাময়িকভাবে পর্দার বিষয়ে শিথিলতা রয়েছে।

আর ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনায় হাজী মহিলার জন্য নেকাব পরিধান নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু নেকাব নিষিদ্ধ হওয়ার মানে চেহারা অনাবৃত রাখা নয়। নেকাব নিষিদ্ধ হওয়া মানে চেহারার চামড়ার সাথে লেপ্টে দিয়ে কাপড় বাঁধা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝায়। 'নেকাব'-এর ব্যাখ্যা জানলে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নেকাব বলা হয় এমন কাপড়কে, যা চেহারার সাথে মিশে থাকে। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

النقاب أي البرقع في وجوههن بحيث يصل إلى بشركهن.

আল্লামা ইবনে হাজার বলেন,

والنقاب الخمار الذي يسد على الانف اوتحت المحاجر. مرقاة (٥/٥٨٨)

নেকাব ঐ ওড়নাকে বলা হয়, যা নাকের উপর বা চোখের নিচে বাঁধা হয়। (ফাতহুল বারী ৪/৬৫)

বুঝা যাচ্ছে, ইহরাম অবস্থায় এমনভাবে চেহারায় কাপড় বাঁধতে বা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, যা চেহারার সাথে লেপ্টে বা মিশে থাকে। সুতরাং যে কাপড় মাথার দিক থেকে ফেলে চেহারা থেকে কিঞ্চিৎ দূরত্ব রেখে ঝুলানো হয়, উপরোক্ত হাদীসে তা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝানো হয়নি। কেননা, আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনায় হাজী মহিলার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে–

المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت اثوابا من ورس اوزعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها ان شاءت. السنن الكبرى للبيهقي (٩٠٥٠)

## হাজী মহিলার চেহারায় কাপড় ঝুলানোর পদ্ধতি

শাইখ যাকারিয়া রহ. নকল করেন, হানাফী ও শফেয়ীদের নিকট হাজী মহিলার জন্য চেহারায় কাপড় এমনভাবে ঝুলানো আবশ্যক, যেন চেহারার সাথে সামান্য মিশে না থাকে; বরং কোন প্রক্রিয়ায় চেহারা থেকে পার্থক্য বজায় রাখবে। আর মালেকী ও হাম্বলীদের মত হলো, প্রয়োজনে কাপড় চেহারার সাথে লেগে থাকলেও অসুবিধা নেই। (বযলুল মাজহুদ ৯/৬১, বাদায়িউস সানায়ে ৩/২০৭, কিতাবুল মাজমু ৭/১৭৩, আল-মুগনী ৫/১৫৮, দলীলুত তালিব; পৃষ্ঠা ১১৫)

فالحنفية والشافعية قالوا: يجب ان لا يلاصق بوجهها شيئ بل تبعد الغطاء بالخشبة وغيرها...

আল্লামা ইবনুল হুমাম লিখেছেন, উলামায়ে আহনাফ বলেন, চেহারার উপর কোন কাপড় লটকে দেয়া এবং মাঝে ফাঁকা রাখা উচিত। চেহারা থেকে কাপড় পৃথক রাখার জন্য তারা তাঁবু আকৃতির কাষ্ঠদণ্ড রাখার প্রস্তাব করেছেন, যা চেহারার উপরে রেখে তার উপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। (ফাতহুল কাদীর ২/৪০৫)

والمستحب أن تسدل على وجهها شيئا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها الثوب، ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة.

ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ হানাফী (মৃত্যু : ৮৫৪ হি.) নেহায়া কিতাবের উদ্ধৃতিতে লিখেন,

قال صاحب النهاية: واعلم ان سدل الشيئ على وجهها واجب عليها كما ذكر في الواقعات للناطقى... ان المرأة المحرمة ترخى على وجهها خرقه. وتجافى عن وجهها، ودلت المسئلة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للرجال.

চেহারায় কোন কিছু ঝুলিয়ে দেয়া ওয়াজিব। (আল-বাহরুল আমীক ফী মানাসিকিল উমরা ওয়াল-হাজ্জ ২/৭১২, মা'আরিফুস সুনান ৬/১০০)

উপরোক্ত প্রথম উদ্ধৃতি থেকে চেহারায় কাপড় ঝুলানো মুস্তাহাব বুঝা যায়, আর দ্বিতীয়টি থেকে ওয়াজিব বুঝা যায়।

পরবর্তী উলামায়ে কেরাম দু'টি বক্তব্যের মাঝে সামঞ্জস্য সাধন এভাবে করেছেন যে, প্রচণ্ড ভিড় থাকলে এবং এ কারণে ক্ষতির মধ্যে পড়ার আশঙ্কা থাকলে চেহারা আবৃত করায় কিছুটা শিথিলতা রয়েছে; অন্যথায় ওয়াজিব।

মালেকী মাযহাবে এ বিষয়টির বর্ণনা এভাবে এসেছে– নির্ভরযোগ্য কথা হলো, যখন পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে পর্দার ইচ্ছা করবে তখন এর জন্য কাপড় দ্বারা চেহারা ঢাকা জায়েয আছে; ফিতনার আশঙ্কা থাকুক কিংবা না থাকুক। হ্যাঁ, যদি ফিতনার আশঙ্কা করে তখন ঢাকা ওয়াজিব। (আশ-শরহুস সগীর ২/৭৫)

حاصل المعتمد أنها متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقا علمت أوظنت الفتنة بها أم لا ، نعم إذا علمت أوظنت بها وجب.

## হাত মোজা প্রসঙ্গ

হাজী মহিলা যদি ইহরাম অবস্থায় হাত মোজা পরতে চায় তাহলে পরতে পারবে। হাজী মহিলার হাত মোজা পরিধানের বিষয়টি সাহাবা যুগ থেকে মতভেদপূর্ণ।

হযরত আলী, হযরত আয়েশা, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. প্রমুখ সাহাবী হাজী মহিলার জন্য হাত মোজা পরিধান জায়েয বলেছেন। ইমাম আতা, সুফিয়ান সাওরী ও আবূ হানীফা রহ.-ও এ মত পোষণ করেন।

ইমাম ইবনে কুদামা বলেন,

كان سعد بن أبي وقاص يلبس نباته القفازين وهن محرمات ورخص فيه علي وعائشة وعطاء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة. (المغني)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. স্বীয় কন্যাদেরকে ইহরাম অবস্থায় মোজা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। (কিতাবুল উম্ম ৩/৫২১, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল-আসার; হা.নং ২৯২৭

كان سعد بن ابي وقاص يأمر نباته أن يلبس القفازين في الاحرام.

হযরত আয়েশা রাযি.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে,

انها رخصت لها في لبس القفازين.

তিনি হাজী মহিলাকে হাত মোজা পরিধানের অনুমতি দিতেন। (আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ৪/৭৯)

ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শাইবানী বলেন,

والمرأة كالرجل في جميع ما وصفناه غير انها تلبس ما بدء لها من الخف والقفازين. (كتاب الاصل)

মহিলাগণ হজ্জের অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষের মতো। তবে পোশাক যা ইচ্ছা পরতে পারবে ... পা মোজা, হাত মোজা ইত্যাদি পরতে পারবে।

ইমাম কুদূরী বলেন,

قال اصحابنا: يجوز للمحرمة لبس القفازين.

উলামায়ে আহনাফ বলেন, হাজী মহিলা হাত মোজা পরিধান করতে পারবে। (আত-তাজরীদ ৪/১৭৭৬)

وعن الشافعي فيه روايتان (في كتاب الأم ٣/٥٣١) فقال في موضع: ولا بأس ان تلبس المرأة المحرمة القفازين لكن قال الامام النووي: الاصح عنده بالعدم فقال: وهل يحرم عليها

لبس القفازين؟ فيه قولان مشهوران. اصحهما عند الجمهور تحريمة ... ويجب الفدية. (المجموع ٧/١٧٣)

وعند المالكية ايضا لا يجوز: (نفي المدونة الكبرى ...) هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين؟ قال: نعم، قلت: فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك؟ قال: نعم.

وعند الحنابلة: ... فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال احرامها، وهذا قول ابن عمر، وهذا قال عطاء، طاوس ومجاهد والنخعي ومالك واسحاق. (المغني ٣/٣٠٤)

واستدلوا بحديث ابن عمر.

কোন কোন মুজতাহিদ হাত মোজা পরিধান করতে নিষেধ করেন। তারা হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

মহিলারা নেকাব পরিধান করবে না এবং হাত মোজা পরিধান করবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮/৩৮)

বর্ণনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তবে কোন কোন সূত্রে ইবনে উমর রাযি.-এর উক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

'হাজী মহিলা হাত মোজা পরিধান করবে না' (لا تلبس القفازين) হাদীসের এ অংশটি রাসূলের কথা, নাকি ইবনে উমর রাযি.-এর নিজস্ব উক্তি ও মাযহাব– এ নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মাঝে বিস্তর মতভেদ হয়েছে। ইমাম ইবনে আব্দুল বার, ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ প্রমুখ এ অংশকে মারফূ' তথা 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য' সাব্যস্ত করেছেন। (আল-ইসতিযকার ৪/১৫)

আবার অনেক মুহাদ্দিস এটিকে মওকূফ বা ইবনে উমরের নিজস্ব উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক মতের পক্ষে দলীল রয়েছে। যারা মওকূফ বলেন, তাদের কথা হলো, মূসা ইবনে উকবা ও নাফে উভয়ে ইবনে উমর থেকে মওকূফ ও মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর ও মালেক রাযি.-সহ অনেকে নাফে থেকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বরং উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর স্বীয় বর্ণনায় উক্ত অংশটি যে ইবনে উমরের উক্তি তা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। তিনি ولا ورس শব্দের পর বলেন, وكان يقول – أي ابن عمر – لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.

এ ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা তার বর্ণনায় যিয়াদাহ বা আলোচ্য বর্ণনার চেয়ে অতিরিক্ত। তিনি যেহেতু নির্ভরযোগ্য, তাই তার যিয়াদাহ গ্রহণযোগ্য।

قال ابو حاتم: سألت احمد بن حنبل عن مالك وايوب وعبيد الله بن عمر ايهم اثبت في نافع؟ قال: عبيد الله اثبتهم واحفظهم واكثرهم رواية.

তাছাড়া কোন কোন সূত্রে হাদীসের অন্যান্য অংশ থাকলেও لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين অংশটি নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ অংশটি ইবনে উমরের উক্তি। দেখুন, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৮২৩

আল্লামা কাশ্মিরী রহ. মওকূফ ও মারফূ' হওয়ার বিষয়ে বুখারী রহ.-এর মত সম্পর্কে বলেন,

اختلف رفع هذه الجملة ووقفها، ولم يقض المصنف فيه بشيئ، ويمكن ان يكون مال إلى الوقف.

বাক্যের এ অংশটি মারফূ' নাকি মওকূফ এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। বুখারী রহ. সম্ভবত মওকূফ হওয়ারই প্রবক্তা। (ফয়যুল বারী ৪/৩৯)

সুতরাং যারা হাত মোজা পরিধানের অনুমতি দেন তারা 'হাত মোজা পরিধান করবে না' কথাটি ইবনে উমরের উক্তি ও মাযহাব মনে করেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য নয়। তাই তারা ভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে ইবনে উমর রাযি.-এর মাযহাব ছেড়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আয়েশা ও আলী রাযি.-এর মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটাই হানাফী ফকীহদের নির্ভরযোগ্য মত।

**পা মোজা প্রসঙ্গ**

হাজী মহিলা ইহরাম অবস্থায় পা মোজা পরিধান করতে পারবে। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب ... والخف للمرأة.

আয়েশা রাযি. মহিলাদের জন্য মোজা পরিধানে শরয়ী কোন অসুবিধা মনে করতেন না। (সহীহ বুখারী; باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر)

ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেন, সালেম রহ. বলেন, ইবনে উমর রাযি. পায়ের উত্থিত অংশ বরাবর হাজী মহিলার মোজা কেটে দিতেন। একবার সাফিয়্যাহ বিনতে আবূ উবায়েদ তাকে বললেন,

ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك.

আয়েশা রাযি. তাকে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে মোজা পরিধানের ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন। এরপর থেকে ইবনে উমর রাযি. মহিলাদের মোজা আর কাটতেন না। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৮৩১)

**লেখক : পেশ ইমাম, পার্ক সংলগ্ন জামে মসজিদ, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭**

**(২ পৃষ্ঠার পর)**

## সম্পাদকীয়

এই অপূর্ণ মুসলমানেরাও সমাজে কম অনিষ্ট ছড়ায় না। এ শ্রেণীটি ইসলামের জন্য এক মহাকলঙ্ক। এরা জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পদাঙ্ক অনুসারী। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও খারাপ। এই শ্রেণীটির তুলনা পঁচা পোলাও, যা পঁচা-ভাতের চেয়েও বেশি দুর্গন্ধযুক্ত। বস্তুত মুসলিমসমাজে যত অন্যায়, অবিচার, অবক্ষয়– এগুলো এই শ্রেণীর মুসলমানদের অবদান!

**তিন. উদারতার নামে অমার্জনীয় শিথিলতা:**

সমাজে একশ্রেণীর মুসলমান আছে, যারা ধর্মে-কর্মে মোটামুটি পর্যায়ের। এরা অন্যায়-অপরাধের সঙ্গে তেমন জড়িত নয়, কিন্তু বেজায় ভদ্দরলোক; কারো কাছেই বদনাম কুড়াতে চায় না। এরা অন্যায় করে না ঠিক, কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়; অপরাধীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। এদের কাছে সবাই ভালো লোক। এরা দীনী বিষয়ে রক্ষণশীলতাকে অপছন্দ করে। তথাকথিত উদারপন্থীদেরকে বেশি পছন্দ করে। নিজেদের কথিত উদার মানসিকতার কারণে ধর্মের লেবাসধারী লোকদেরকেও তারা ধর্মগুরু মনে করে। অনেক ক্ষেত্রে এই উদারপন্থীদের প্রশ্রয়েই লেবাসধারী লম্পটেরা নারী-জাতির মান-ইজ্জত ও জনগণের জান-মালের ক্ষতি করার সুযোগ পায়। ফলে নির্বোধ শ্রেণীর লোকেরা ইসলামকে ভুল বোঝার প্রয়াস পায়। এরা বেতের নামাযের দু'আয়ে কুনূতে ونترك من يفجرك (হে আল্লাহ! আমরা আপনার অবাধ্যকে বর্জন করি।) পড়ে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে আমল করে না। এই উদারপন্থী মুসলমানগণও সমাজের বর্তমান অবক্ষয়ের জন্য কম দায়ী নয়।

**চার. যথাসময়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা:**

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী এমন থাকা উচিত, যারা সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে, তারাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরা আলে-ইমরান-১০৪)

বর্তমানে যেখানে হর-কিসিমের শয়তানী কাজের প্রচার-প্রসারের জন্য সংঘবদ্ধ দল-উপদল রয়েছে, সেখানে সৎ ও কল্যাণ কাজের আদেশ ও অন্যায়-অশ্লীল কাজে বাধা প্রদান করার জন্য সংঘবদ্ধ কোনো দল নেই বললেই চলে। নগণ্য সংখ্যক লোক একেবারে সীমিত গণ্ডিতে আশিংকভাবে সৎকাজের আদেশের কাজটি করলেও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করার ক্ষেত্রে তাদের অনেকেই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের আত্মপ্রবঞ্চনার হাতিয়ার হলো, শুধু হেকমত আর হেকমত। বরং অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার সুযোগ আসতে পারে, এমন ক্ষেত্রসমূহ থেকে এরা যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। ইমাম আবূ আলী দাক্কাক রহ.-এর মতে এরা হলো, বোবা শয়তান। ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীতে এরা যথেষ্ট মনোযোগী, কিন্তু অন্যায়-অপরাধ দেখলে চোখ বন্ধ করে সটকে পড়ে। নিরপরাধ মানুষকে গণপিটুনী দিতে লোকের অভাব নেই, কিন্তু এমন ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার জন্য বা প্রতিবাদ করার জন্য কি একজনও আছে? সমাজ ও জাতির অধঃপতনের জন্য এ জাতীয় দরবেশরাও দায় এড়াতে পারবে না।

**পাঁচ. সর্বনাশা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া:**

কুরআনে পাকে মাদক ও জুয়ার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

অর্থ: তারা তোমাকে মদ ও জুয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও যে, এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বিশাল পাপ ও মানুষের কিছু উপকার। এ দু'টোর উপকার অপেক্ষা ক্ষতি অনেক বেশি। (সূরা বাকারা-২১৯)

আল-কুরআনের এ বাণীটি পরিপূর্ণরূপে লাগসই হয় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপারে। কিছু লোকের জন্য অল্প কিছু ক্ষেত্রে মিডিয়ার উপকারিতা অনস্বীকার্য, কিন্তু এর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, এমন লোক সম্ভবত হাজারেও একজন পাওয়া দুষ্কর। নীতি ও চরিত্র নষ্ট করার হেন কোন উপাদান নেই, যা এই মিডিয়া সরবরাহ করে না। এর বিষাক্ত ছোবলে তরুণসমাজ ও যুবসমাজ ধ্বংসের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। সমাজে ছড়িয়ে পড়া যিনা-ব্যভিচার ও নগ্নতা-বেহায়াপনার জন্য সিংহভাগ দায়ী এ মিডিয়া। বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে এই মিডিয়া মাদকের নেশার চেয়েও মারাত্মক, মাদকের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পার্থক্য হলো, মাদকে আসক্ত হয় অল্পসংখ্যক পরিবারে মাত্র এক-দু'জন, আর মিডিয়ার নেশায় আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ পরিবারের প্রায় সকল সদস্য। কোন জাতির দ্রুত ধ্বংসের জন্য এ একটি মহামারীই যথেষ্ট।

**ছয়. বিজাতীয় ষড়যন্ত্র:**

বিশ্বের বুকে সম্ভবত আমরাই এমন, যাদের ওপর যে কোন ক্ষতিকর বস্তু ও বিষয়ের ক্ষয়-ক্ষতির সক্ষমতা পরীক্ষা করা যায়। এজন্যই বোধহয় বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র ও সংস্থা মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকর সকল বিষয় ও বস্তু প্রথমে আমাদের উপর প্রয়োগ করে তার ক্ষতির সক্ষমতা নিরূপণ করে। এই কাজে তারা আমাদের কিছু শিক্ষিত কুলাঙ্গারকে ক্রয় করে নেয়। এই কুলাঙ্গাররাও নির্বিচারে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি হয়। গরু-ছাগল কিনে হাট থেকে বাড়িতে আনতেও তো কিছুটা কষ্ট হয়, কিন্তু এসব বুদ্ধিজীবিকে ক্রীতদাস বানানো তার চেয়েও সহজ! জাতিকে নীতি-নৈতিকতার দোহাই দিয়ে বিশেষত ধর্মের উদ্ধৃতি দিয়ে যখন কোন কাজে উদ্বুদ্ধ বা বারণ করা হয়, তার মোকাবেলায় এরা তখন প্রগতি ও উন্নতির নামে খেঁকশিয়ালের পালের মতো একযোগে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। অপরদিকে নীতি-নৈতিকতা জলাঞ্জলী দিয়ে জাতি যখন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে, মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়, তখন এই বর্ণচোরারা সব লেজ গুটিয়ে গর্তে চলে যায়।

**সাত. ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা:**

যে শিক্ষা ছিলো জাতির মেরুদণ্ড আজ সে শিক্ষাই যেন জাতির মেরুধ্বংস। এ শিক্ষাব্যবস্থা যারা প্রণয়ন করেছে তারা স্পষ্ট ভাষায় এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিবরণ দিয়ে গেছে। বাস্তবে এ শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো একটি বিষবৃক্ষ। আজ এ বৃক্ষ কাঁটায়-পাতায়, গন্ধে-দুর্গন্ধে বিশাল মহীরূহ। ছেলে-মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক, নেশা ও সন্ত্রাসই যেন এ শিক্ষার মূল পাঠ্য। এর বদৌলতে বাবা-মায়ের অতি আদরে লালিত সন্তান বন্য পশু হয়ে ঘরে ফেরে। এই শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কেউ এর কুপ্রভাব থেকে বাঁচতে চাইলে অবশ্যই তার জীবনে বিশেষ দীনী শিক্ষা বা কোন দীনী ব্যক্তিত্বের শক্তিশালী নজরদারী থাকতে হয়। নচেৎ বাস্তবতা হলো, এ শিক্ষায় শিক্ষিতজনই আজ জীবন ও মানবতা-বিধ্বংসী প্রায় সকল বস্তু ও বিষয়ের আবিষ্কারক। আখলাক-চরিত্র নষ্ট করার জন্য যেখানে পূর্বপ্রণীত সহশিক্ষানীতিই যথেষ্ট ছিলো, সেরের ওপর সোয়া-সের হিসেবে সেখানে এখন ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের জন্য 'মাই জেমস গাইড' নামক যৌনশিক্ষাকেও সিলেবাসভুক্ত করা হচ্ছে। এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের ভবিষ্যত যে কী, কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে!

**আট. দুর্বল বিচারব্যবস্থা:**

মানবরচিত বিচারব্যবস্থার তুলনা হলো, ছাগলদের জীবনচলার জন্য রামছাগলের দ্বারা প্রস্তুতকৃত নীতিমালা। স্রষ্টা কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিমালার পরিবর্তে মানবরচিত নীতি অনুসরণ করে মানবজাতি আজ ছাগলের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি সেটাও পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় দলীয় চিন্তাধারার ভিত্তিতে। অর্থ-বিত্ত আর ক্ষমতাই এই বিচারব্যবস্থার মূল শক্তি। এর দ্বারা সাধারণত শিষ্টের দমন আর দুষ্টের লালন হয়ে থাকে। ফলে মজলুম ও বঞ্চিত মানুষ এর প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না। আর এ অনাস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার ভয়ঙ্কর প্রবণতা। মজলুম ও বঞ্চিতরা এখন এতোটাই হতাশাগ্রস্ত যে, নিজের জীবনের কোন রকম তোয়াক্কা না করে বিচারকের সামনে আসামীকে খুন করতে উদ্যত হয়!

মোটকথা, এই জাতির ধ্বংস ও বরবাদির সকল আয়োজন ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। একটি ব্যাধিই যেখানে গোটা জাতিকে অশান্তির নরকে ঠেলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো, সেখানে জাতি আজ সকল মারণব্যাধিতে আক্রান্ত। নমুনা হিসেবে তা থেকে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। কেউ যদি অন্তত ব্যক্তিগত পর্যায়েও এগুলো থেকে মুক্ত থাকতে চায়, তাহলে আশা করা যায় তার ইহকাল কষ্টকর হলেও পরকাল হবে প্রশান্তিময় । আর পরকালের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

জ রু রী ও য়া যা হা ত

# দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান সংকট নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

**প্রথম প্রশ্ন :**

***ইসলামী শরীয়তে স্থায়ী আমীর ছাড়া শুরায়ী নেযামের কোন ভিত্তি আছে কি? যদি না থাকে তবে এমন এক গন্তব্যের দিকে উম্মতকে নেয়া হচ্ছে কেন, তা-ও আবার উলামাদের নামে?***

**উত্তর :**

কুরআন ও সুন্নাহয় যে আমীরের কথা বলা হয়েছে এবং তাকে মান্য না করলে কঠিন ধমকির কথা এসেছে, তা শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং তার পক্ষ হতে নিযুক্ত গভর্নর বা আমীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দাওয়াত ও তাবলীগের যিম্মাদার মৌলিকভাবে সেই আমীরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাকে হুবহু শাসকের পর্যায়ে ধরে– ইসলামী শরীয়তে স্থায়ী আমীর ছাড়া শুরায়ী নেযামের কোন ভিত্তি আছে কিনা– এই প্রশ্ন করাই অনুচিত।

তবে হ্যাঁ, যেহেতু দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সংগঠন সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন, তাই সঠিকভাবে কর্ম পরিচালনার স্বার্থে এর একজন যিম্মাদার বানানো জরুরী। আর এটা শুধু তাবলীগের ক্ষেত্রেই নয়; বরং যে কোন সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য জরুরী। আর এই জরুরত ও প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র ইন্তেযাম তথা ব্যবস্থাপনার খাতিরে; শরয়ী ফরয কিংবা ওয়াজিব হিসেবে নয় এবং এই যিম্মাদারের অধীন হয়ে তাবলীগ করাও সকলের জন্য আবশ্যক নয়। যিম্মাদার বানানোর পাশাপাশি আহলুল হাল্লি ওয়াল-আকদ্ তথা হক্কানী উলামায়ে কেরামের পরামর্শে একটি শুরাও গঠন করা জরুরী, যাতে এই শুরা যিম্মাদারী পালনে যিম্মাদারকে সাহায্য করতে পারেন এবং যিম্মাদার যদি শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হন তাহলে তাকে সংশোধন কিংবা বরখাস্ত করে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমীরের দায়িত্ব বেশি হলেও ক্ষমতা বেশি হবে শুরার।

মোটকথা, শরীয়তে আমীর ও শুরা কোনটিরই গুরুত্ব কম নয়, শাসনকার্য পরিচালনায় উভয়টিই জরুরী। আর দীনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইন্তেযামের জন্য দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়; একটি অপরটি হতে বিচ্ছিন্ন নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে একে তো প্রচলিত পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি নয়, উপরন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের আমীর ও শুরা কোনটিই শাসনক্ষেত্রের আমীর ও শুরার হুকুমে নয়। পক্ষান্তরে, উলামায়ে কেরাম যে মাওলানা সা’দ সাহেবের আমীর হওয়াকে অস্বীকার করছেন তা এই কারণে নয় যে, তাদের নিকট ইসলামী শরীয়তে **‘শুরায়ী নেযামই’** হলো আসল এবং শুরা থাকলে কেউ আমীর থাকতে পারবে না। বরং তার কারণ হলো, প্রথমত মাওলানা সা’দ সাহেবের মধ্যে এই মহান দীনী কাজের আমীর হওয়ার যোগ্যতাই নেই, দ্বিতীয়ত তাকে কোন শুরা এ কাজের আমীর বানায়নি। তিনি নিজেই নিজেকে আমীর হিসেবে দাবী করে স্বঘোষিত আমীর হয়েছেন। তো যাকে আমীর বানানোই হয়নি তাকে তো কোন বিবেকসম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তিরও আমীর মানার কথা নয়, তাহলে উলামায়ে কেরাম কিভাবে তাকে যিম্মাদার মানবেন?

প্রশ্ন হতে পারে, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা সা’দ সাহেব যিম্মাদার হওয়ার যোগ্য নয় কেন? তো এর উত্তর হলো, দাওয়াত ও তাবলীগের মত মুবারক মেহনতের যিম্মাদার হওয়ার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন (যেমন, বিশুদ্ধ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হওয়া, বিজ্ঞ আলেমেদীন হওয়া, সাহেবে নিসবত বুযুর্গ হওয়া, পরিপূর্ণরূপে শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা ইত্যাদি) সেগুলো তার মধ্যে নেই। তাই তিনি যিম্মাদার হওয়ার উপযুক্তই নন। বরং তিনি যেভাবে কুরআন ও হাদীসের মনগড়া আজগুবী অপব্যখ্যা, জাল হাদীস বর্ণনা, নবীদের ব্যাপারে আপত্তিকর মন্তব্য এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর বয়ান করে চলছেন তা একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কোনদিন করতে পারেন না। ফলে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের অন্তর্ভুক্ত আছেন কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কতক লোক শুধুমাত্র হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার সুবাদে কুরআন-হাদীসকে উপেক্ষা করে সা’দ সাহেবকে আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত আমীর মানছেন এবং তাকে আমরণ আমীর মানার ঘোষণা দিচ্ছেন। এমনকি কুরআন-হাদীসে যে আমীর বা শাসকের কথা বলা হয়েছে, তাকে সেই শাসকের আসনে সমাসীন করছেন, যা গোঁড়ামী ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্ট যে, তাদের উদ্দেশ্য কুরআন-হাদীস মানা নয়; বরং সা’দ সাহেবের পূজা করা। অতএব, নিজের ঈমান ও আমলের হেফাযতের লক্ষ্যে এই জঘন্য কাজ হতে বিরত থাকা আবশ্যক।

আর আপনার প্রশ্নের দ্বারা বোঝা যায়, আপনি মাওলানা সা’দ সাহেবকে আমীর হওয়ার যোগ্য মনে করছেন, তা-ও আবার ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের মত আমীর! তাছাড়া আপনার ধারণায় আলেমগণ শুধু আমীর হওয়ার বিষয় নিয়েই তার বিরোধিতা করছেন এবং আমীর হওয়ার বিষয় ছাড়া তার মধ্যে আর কোন আপত্তিকর বিষয় নেই। আপনি বাস্তবিকই এমন ধারণা পোষণ করে থাকলে তা সম্পূর্ণই ভুল। (সূরা বাকারা- ২২৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৬৫২, ১৭৩৩, ১৮৪০, তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১৬৬, ৩৮৪, মা’আরিফুল কুরআন ২/২১৯-২২১)

**দ্বিতীয় প্রশ্ন :**

***যদি কেউ (চাই আলেম হোক কিংবা গাইরে আলেম) অন্য কোন ব্যক্তির কথা না শুনে, অথবা শুনলেও কাট-ছাঁট করে বলে অথবা বিকৃত করে বলে তাহলে শরীয়তে তাদের বিধান কী?***

**উত্তর :**

যদি কেউ অন্যের কথা না শুনেই তার নামে কোন ভুল কথা বর্ণনা করে, তাহলে তা অন্যের ব্যাপারে মিথ্যাচার ও অপবাদ হবে, যা মারাত্মক গুনাহের কাজ। আর যদি শুনেই বলে, কিন্তু তার কথাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে তাহলেও তা গুনাহের কাজ হবে। পক্ষান্তরে যদি কাট-ছাঁট করে বলে এবং উদ্দেশ্য থাকে শুধুমাত্র তার বাস্তব ভুলটা ধরিয়ে দেয়া এবং তার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা, তাহলে এতে কোন দোষ নেই; বরং ভুল ধরিয়ে তার খায়েরখাহী করার কারণে যিনি ভুল ধরিয়ে দিলেন তার সওয়াব হবে। যেমনটি করছেন উলামায়ে কেরাম

মাওলানা সা'দ সাহেবের ভুল ধরিয়ে দিয়ে। আর তা উলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ এক যিম্মাদারীও বটে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক্কানী উলামায়ে কেরামকে বিশেষ তিনটি যিম্মাদারী দিয়েছেন। যথা, (১) যারা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে (যেমনটি করছে আহলে হাদীসরা) তাদেরকে প্রতিহত করা, (২) বাতিলপন্থীদেরকে (যেমন, কাদিয়ানী, শিয়া সম্প্রদায়) বাতিল ঘোষণা করা, (৩) মূর্খ তথা যাদের মধ্যে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা নেই (যেমন, মওদূদী, ড.জাকির নায়েক প্রমুখ) তাদের অপব্যাখ্যাকে রদ করা। তো নিজেদের যিম্মাদারী পালনার্থে উলামায়ে কেরাম সা'দ সাহেবের ভুলগুলো জনগণের মাঝে বয়ান করছেন, যাতে সাধারণ জনগণ তার বক্তব্য শুনে বিভ্রান্ত না হয়। যদি সা'দ সাহেব নিজে নিয়মতান্ত্রিক রুজু করতেন তাহলে উলামায়ে কেরামের জন্য তার ভুলগুলো জনগণকে বলে দেয়া জরুরী হতো না।

মাওলানা সা'দ সাহেবের কৃত কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা খণ্ডন করা এবং তার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে তার সংশোধন করা উলামায়ে কেরামের ঈমানী দায়িত্ব। সা'দ সাহেবের ভুল ধরিয়ে দেয়ার কারণে তারা একদিকে যেমন যিম্মাদারীমুক্ত হবেন অপরদিকে উম্মতকে গোমরাহী থেকে মুক্ত করার কারণে অনেক সওয়াবের অধিকারীও হবেন।

আর যদি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিংবা নিছক বিদ্বেষ উদ্গীরণ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা অবশ্যই অন্যায় ও নিন্দনীয় কাজ। এ কারণে সে অনেক গুনাহগার হবে। আর যদি বিদ্বেষ পোষণ করাটা মনগড়া হয় তাহলে সেটা তার ঈমানের জন্যই হুমকির কারণ হবে, যেমনটি করছেন বর্তমানে এতায়াতপন্থীরা। উদাহরণত কোন আলেমে দীন যখন বলেন যে, 'দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের জন্য একজন আমীর বা যিম্মাদার থাকা আবশ্যক, আর সেই আমীরকে পরিচালনার জন্য শুরাও প্রয়োজন' তখন তারা নিজেদের মাকসাদ হাসিল করার জন্য বয়ানকে কাট-ছাঁট করে অপপ্রচার করতে থাকে যে, 'অমুক মুফতী সাহেব আমীরের পক্ষে, শুরার পক্ষে না।' তো এরূপ কর্মকাণ্ড তাদের ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সকল প্রকার ফেতনা থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৮৯, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৯২২০, শরহু মুশকিলাতুল আসার; হা.নং ৩৮৮৪, ফাতাওয়া শামী ৬/৪০৮)

**তৃতীয় প্রশ্ন :**

***হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলার হাতে হেদায়াত নাই, থাকলে নবী পাঠাতেন না।' 'পতিতা মহিলারা দীনী শিক্ষার বিনিময় গ্রহণকারী আলেমদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আমার আরয হলো, আসলেই কি মাওলানা সা'দ সাহেব কথাগুলো এভাবে বলেছেন? মাওলানা সা'দ সাহেবের কোনো উর্দু বয়ানের অডিও থেকে অথবা সশরীরে উপস্থিত থেকে আপনি কিংবা অন্য কেউ কি একথা শুনেছে? প্রসঙ্গটুকুর আগে এবং পরে খোলাসা করলে ভালো হয়।***

**উত্তর :**

প্রথম বিষয়টি সরাসরি মাওলানা সা'দ সাহেবের অডিও বয়ান থেকে শোনা। তার মূল বক্তব্য হলো–

تم اس خیال کروگے ہدایۃ اللہ کے ہات میں ہے' ہدایۃ اللہ کے ہات میں ہوتی تو اللہ تعالی نبیوں کو کیوں بھیجتے–اللہ تعالی ہدایۃ دینے کے لئے انباء علیہم السلام کو محنت کے لئے بھیجا ہے-

অর্থ : (শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন) 'তোমরা এই ধারণা পোষণ করে থাকো যে, হেদায়াত আল্লাহ তা'আলার হাতে, হেদায়াত যদি আল্লাহ তা'আলার হাতে হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে কেন পাঠাতেন। আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে নবীদেরকে মেহনতের জন্য পাঠিয়েছেন।' (সূত্র : https://www.youtube.com/watch?v=nxlvLskZ44o)

বয়ানের দ্বিতীয় অংশ ('আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে নবীদেরকে মেহনতের জন্য পাঠিয়েছেন') দ্বারা বুঝা যায়, মাওলানা বয়ানের প্রথম অংশটি (হেদায়াত যদি আল্লাহ তা'আলার হাতে হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা নবীদের কেন পাঠাতেন') শুধুমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়েই বলেছেন। অন্য কোন উদ্দেশ্যে তিনি এটা বলেননি। যার দরুন অনেকেই বলে থাকেন যে, মাওলানা সা'দ সাহেব তো এটা বুঝাতে চাননি যে, হেদায়াত আল্লাহ তা'আলার হাতে নয়; বরং হেদায়াত যে আল্লাহ তা'আলার হাতে সে ব্যাপারে তার অসংখ্য বয়ান রয়েছে।

কিন্তু এই বিষয়টিও সকলের জন্য জেনে রাখা আবশ্যক যে, ভুল ভুলই। আগে বা পরের বক্তব্য দ্বারা ভুল কোনদিন শুদ্ধ হয়ে যায় না। যেমন, কেউ যদি ২/৩ ঘণ্টা ব্যাপী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলত এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার পর বয়ানের একপর্যায়ে নিজের প্রতি ওহী আসে মর্মে দাবী করে বসে, তাহলে নবীজীর ফযীলতের উপর তার এই ২/৩ ঘণ্টা বয়ান করাটা একেবারেই বৃথা। একথা বলার কারণে তার ঈমান চলে যাবে। তার জন্য তওবা করা জরুরী। আগে-পরের বয়ান দেখে এটাকে শুদ্ধ বলার কোন সুযোগ নেই।

অনুরূপভাবে যদি কোন ইমাম সাহেব নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফের ৩/৪ পৃষ্ঠা সহীহ শুদ্ধভাবে পড়ে কিন্তু শেষের দিকে এসে এমন মারাত্মক ভুল করে বসে যে, অর্থই পাল্টে যায় তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এখানে একথা বলা চলবে না যে, তিনি তো শুধু এক জায়গায় ভুল করেছেন কিংবা তিনি তো ইচ্ছা করে ভুল পড়েননি।

সুতরাং মাওলানা সা'দ সাহেবের বিষয়টিও অনুরূপ, আগে বা পরের বয়ান দেখে এটাকে সঠিক বলার কোন অবকাশ নেই। বরং মাওলানার কর্তব্য ছিল খাঁটি দিলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করা এবং প্রকাশ্যে রুজু করা। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, তিনি তওবা এবং রুজু তো করেনইনি বরং রুজুর নামে কিছু নাটক করেছেন। উপরন্তু কিছু ভাই না বুঝে অথবা বুঝে-শুনে অন্ধভক্ত হয়ে মাওলানার আগে-পরের বয়ানের দোহাই দিয়ে এ ভুল কথাকে সঠিক বলার হীন চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন।

**কাউকে হেদায়াত দেয়া শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতেই, যদি আল্লাহ না চান তাহলে শত চেষ্টা করে কোন নবীও হেদায়াত দিতে পারবে না**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা খাজা আবূ তালিব, যিনি প্রায় সব ব্যাপারে নবীজীর সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, কুরাইশদের সব ধরণের নির্যাতন থেকে নবীজীকে হেফাযত করার চেষ্টা করেছেন, খাজা আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারপরনাই চেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত না দেয়ার কারণে তিনি দীনে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক পাননি। এমনকি তার অন্তিমকালে যখন তার হেদায়াতের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার চেষ্টা করছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন–

انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء من عباده (القصص:٥٦)
অর্থ : আপনি যাকে চান তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না। বরং আল্লাহ তা'আলাই যাকে চান তাকে হেদায়াত দেন। (সূরা কাসাস- ৫৬)
এছাড়া প্রায় ৮০টি আয়াতে বলা হয়েছে যে, হেদায়াত দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আর মাওলানা সা'দ সাহেবের উক্ত বক্তব্য এই সকল আয়াতের সরাসরি বিরোধী। এতদসত্ত্বেও যারা মাওলানা সা'দ সাহেবের এ বক্তব্যকে সঠিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবে অবশ্যই তাদের ঈমানে ঘাটতি আসবে। আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করুন। আমীন।
আর দ্বিতীয় বিষয়টি দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে জড়িত ভারতীয় আলেমদের একটি জামা'আত وفاق علماء الهند কর্তৃক সংকলিত মাওলানা সা'দ সাহেবের বয়ান সংবলিত একটি কিতাবে রয়েছে। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন বারিধারা মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-ফারুক সাহেব 'মাওলানা সা'দ সাহেবের সঙ্গে আলিমদের দ্বিমত কেন?' শিরোনামে। সেই কিতাবে মাওলানা সা'দ সাহেবের ৬২টি গোমরাহ বয়ানের মধ্যে এটি ২৪ নম্বরে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া মাওলানা সা'দ সাহেবের পক্ষ হয়ে তথাকথিত কিছু আলেম এবং কতক ইঞ্জিনিয়ার মাওলানা সা'দ সাহেবের ভুলগুলোকে স্বীকার করে তার পক্ষ হয়ে ওকালতি করে 'ভুলগুলো কি আসলেই ভুল' নামে কিতাবও রচনা করেছেন, সেখানে প্রশ্নোক্ত উক্তিটির ব্যাপারেও কিছু দলীল-প্রমাণ দিয়ে তাকে সঠিক বলার চেষ্টা করা হয়েছে। আর মাওলানা সা'দ সাহেবের পক্ষ থেকেও তা অস্বীকার করা হয়নি। সুতরাং তার এই বক্তব্যকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তিনি বয়ানটি করেছেন মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসায় আলেমদের একটি মজলিসে। তার এই বক্তব্য যে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সেটা জনগণের সামনে স্পষ্ট করার জন্য মাযাহিরুল উলূমের মুফতী শুআইব আহমদ সাহেব ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।
এছাড়াও ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত আওরঙ্গাবাদের ইজতিমায়ও তিনি একই ধরণের কথা বলেছেন। তার বক্তব্য হলো,
بعض لوگ مدرسہ میں پڑھانے کو بھی دین کا کام سمجھ رہے ہیں، یہ بھی بڑا دھوکہ ہے
অর্থ : কতক লোক মাদরাসায় পড়ানোকেও দীনের কাজ মনে করেন, এটাও বড় একটা ধোঁকা। অর্থাৎ তার মতে মাদরাসায় পড়া এবং পড়ানো দীনের কোন কাজ নয় (নাঊযুবিল্লাহ)।
**দীনের যত খেদমত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরী হলো মাদরাসায় পড়ানো**
মাদরাসা হলো ইলমের মারকায, তাবলীগ করতে হলে ইলম ছাড়া গতি নেই। কেননা, তাবলীগ হলো পৌঁছানো, ইলম না থাকলে তাবলীগই বা করবে কিসের? ইলম ছাড়া তাবলীগ গোমরাহীর কারণ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়ার মধ্যে তা'লীমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সুনানে দারেমীর ৩৬১ নং হাদীসে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. হতে বর্ণিত– মসজিদে নববীতে তা'লীম এবং দু'আর দু'টি হালকার মধ্যে দু'আর ব্যাপারে বলেছেন এটা ভালো কাজ, আর তা'লীমের ব্যাপারে বলেছেন– এটা অনেক ভালো, আর 'আমি মু'আল্লিম হিসেবে প্রেরিত হয়েছি' এবং তিনি ইলমের মজলিসেই বসে পড়েন।
নবীজী আরও ইরশাদ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুরআন এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গোমরাহ হবে না। উল্লিখিত হাদীস দ্বারাও বুঝে আসে ইলম ছাড়া তাবলীগও গোমরাহী। সুতরাং মাদরাসাকে বাদ দিয়ে দীনের খেদমত সম্ভব নয়।
আর সাহাবাদের যুগ থেকেই দীনী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত আলেম-উলামার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতা নির্ধারিত ছিল। পরবর্তিতে এ ভাতা প্রদানের দায়িত্ব জনগণের দায়িত্বে অর্পিত হয়েছে এবং উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে দীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বেতন-ভাতা জায়েয। সুতরাং এর কারণে আলেমগণ পতিতাদের পরে জান্নাতে যাবেন এমন কথা উচ্চারণ করা বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের পক্ষেই সম্ভব। এ মর্মে যত প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে, সবগুলোতেই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। তাছাড়া এটা সম্পূর্ণ জাল বর্ণনা।
(সূরা কাসাস- ৫৪, সুনানে দারেমী; হা.নং ৩৬১, মুআত্তা ইমাম মালেক ২/৮৯৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৩৭, মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী কৃত মাকালা নম্বর-৩; তা'লীম ও তাদরীস পর উজরত লেনে কী তাহকীক)
**চতুর্থ প্রশ্ন :**
***হাদীসের অর্থ: 'মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে বিনা যাচাইয়ে তা-ই বর্ণনা করে।' ঐ ব্যক্তিগুলো কারা?***
**উত্তর :**
হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সকল ব্যক্তি যারা যে কারও কাছ থেকে কোন কিছু শোনার পরই বর্ণনা শুরু করে দেয়; এটা চিন্তা করে না যে, যার থেকে শুনেছে সে নির্ভরযোগ্য কিনা, কিংবা তার কথার উপর ভরসা করা যায় কিনা। অথবা বক্তা অনির্ভরযোগ্য হলে অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করে যাচাই করা ছাড়াই বলে বেড়ায়। পক্ষান্তরে যদি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (যেমন, কোন হক্কানী আলেম কিংবা এমন ব্যক্তি যিনি সব সময় সত্য/বিশুদ্ধ কথা বলেন মর্মে জানা আছে) হতে শুনে বলে কিংবা অন্য কারো হতে শোনার পর সেটা আরও কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করে শুনে নেয় তাহলে বর্ণনাকারীগণ এ হাদীসের ধমকির অন্তর্ভুক্ত হবেন না। মাওলানা সা'দ সাহেবের যে সকল উক্তির ব্যাপারে আলেমগণ আপত্তি করেছেন সবগুলো বহু নির্ভরযোগ্য সূত্রে যাচাই করা। বরং সা'দপন্থীরা 'আলেমগণ যাচাই ছাড়া কথা বলেন' মর্মে যে কথা প্রচার করে, এর কারণে তারাই প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসের আলোকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবেন। (মুসনাদে ইবনুল জা'দ; হা.নং ৬২৭. মিরকাতুল মাফাতীহ ১/২৫৮, ফয়যুল কাদীর ৪/৫৫১)
**পঞ্চম প্রশ্ন :**
***জুমহুর বলতে আমরা কোন্ সমর্থকদের বুঝবো? যারা যাচাই করে সমর্থন করে নাকি শুধুমাত্র শুনেই সমর্থন করে?***
**উত্তর :**
সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
إِنَّ أُمَّتِي لَاتَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ
এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হি.) বলেন, এখানে السَّوَادِ الْأَعْظَم (সাওয়াদে আ'যম) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উলামায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কেননা জনসাধারণ ও অজ্ঞদের সংখ্যা তো বেশিই হয়ে থাকে। (মিরকাত ১/৩৮৩)
সহীহ বুখারীর ৩৬০৬ নং ও ৭০৮৪ নং হাদীসে হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে যে

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের বড় জামা'আতের অনুসরণ করতে বলেছেন, সে সম্পর্কে আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. তার লিখিত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেন, হাদীসের মধ্যে যে জামা'আতের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য (السواد الأعظم) সাওয়াদে আ'যম। আর সাওয়াদে আ'যম মুসলমানদের দীনী যে সকল বিষয়ে পক্ষাবলম্বন করেন, সেটা এমন সত্য যা মানা ওয়াজিব এবং এমন প্রমাণিত ফরয যার অন্যথা করা কোন মুসলমানের জন্য নাজায়েয।

**উল্লিখিত সকল হাদীস এবং হাদীসের ব্যাখ্যা থেকে আমাদের সামনে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেল–**

১. বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত সাওয়াদে আ'যম এবং জামা'আত দ্বারা উলামায়ে কেরামের বৃহৎ জামা'আত উদ্দেশ্য।

২. আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেতনার যামানায় তাদেরকেই অনুসরণ করতে বলেছেন।

**এখন কথা হলো, কোনো বিষয়ে সমর্থন করার জন্য জুমহুর উলামায়ে কেরামের প্রত্যেকের জন্য কি সরাসরি শুনে সমর্থন করা জরুরী নাকি কিছু লোক শুনলেই চলবে, আর বাকিরা তাদের কথার সমর্থন করবে?**

**এর উত্তর হলো**, কোন বিষয়ে সমর্থন করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটা জরুরী নয় যে, যিনি বলেছেন তার মুখ থেকে বা তার বয়ান থেকে সরাসরি শুনে সমর্থন করবে। বরং নির্ভরযোগ্য কোন মাধ্যমে হলেই যথেষ্ট। আর সকলের পক্ষে সরাসরি শুনে সেটা যাচাই করা সম্ভবও নয়। কুরআন ও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং সে অনুযায়ী আমাদের আমল করাও জরুরী, অথচ তা শুধুমাত্র হক্কানী উলামায়ে কেরামের এক জামা'আতের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। যদি প্রত্যেকের জন্য যাচাই-বাছাই করা জরুরী হতো তাহলে সেটা অসাধ্য হয়ে পড়তো, বিশেষত সাধারণ জনগণের জন্য। কারণ, সাধারণ লোক–ইলমের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই–তাদের পক্ষে দীনী বিষয় যাচাই করা সম্ভব নয়। এমনকি সাহাবায়ে কেরামের তরীকাও এটা ছিল না যে, কোন বিষয় জানার জন্য প্রত্যেক সাহাবী সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান থেকে শুনবেন।

সুতরাং মাওলানা সা'দ সাহেবের বিষয়টিও জুমহুর হক্কানী উলামায়ে কেরাম–যারা দীনী দায়িত্ব পালনার্থে তার ভুলগুলো বয়ান করছেন কিংবা লেখনির মাধ্যমে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন–তাদের সকলের জন্য সরাসরি তার বয়ান থেকে শোনার কোন প্রয়োজন নেই; বরং নির্ভরযোগ্য কিছু আলেমের শোনাটাই যথেষ্ট। আর জনসাধারণের জন্য দীনী সকল বিষয়ে জুমহুর হক্কানী উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া জরুরী।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক এলাকার লোকদের জন্য আবশ্যক হলো– নিজ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হক্কানী আলেমদের মতামত অনুযায়ী চলা। নিজ এলাকার হক্কানী আলেমদের মতামতকে উপেক্ষা করে বিচ্ছিন্ন মতের অনুসরণ করাও গোমরাহী।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬০৬, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২০৯০, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৯৫০, মিরকাতুল মাফাতীহ ১/৩৮৩, ৩৯১)


# মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমাতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

**পাথর ও সিলেকশন বালু**

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

এল.সি কালো পাথর

আমদানীকারক

এল.সি. কালো পাথর, সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

**ঢাকা অফিস**
হাউজ # ৩/৩/১৫, রোড # ৪
চাঁনমিয়া হাউজিং, বাঁশবাড়ি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
০১৭১৬৭১০৭১১, ০১৮৭৬০০৩৫১৮

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

# নববী দায়িত্বের সূচনা

মাওলানা মাহমূদুল হাসান ফরিদপুরী

**(পূর্ব প্রকাশিতের পর)**

নবুয়ত প্রাপ্তির পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তিন বছর আল্লাহর নির্দেশনায় গোপনে দাওয়াত প্রদান করেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৪০)

দাওয়াতের সূচনালগ্নে এ গোপনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবী ছিলো। কেননা, শত শত বছরের অজ্ঞতা ও অনৈতিকতা এবং হঠকারিতা ও অবাধ্যতার বিকৃত মানসিকতার ভিত্তিমূলে গড়ে ওঠা সমাজ-সংসার এবং কৃষ্টি-কালচারের বিপরীতে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে নবীজীর দায়িত্ব ছিলো নিজে নিরাপদ থেকে সমগ্র আরব বরং সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর দাওয়াতের সূচনালগ্ন যদি ধীরতা ও স্থিরতা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে না হতো, তবে এ সত্যের সার্বজনীনতার পথ কণ্টাকীর্ণ হয়ে যেতো। ইসলামের এ দাওয়াত তার জন্মলগ্নেই হোঁচট খেতো। এ কারণেই প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দাবী এটাই ছিলো যে, হকের এই দাওয়াতের সূচনা ধীর-স্থিরভাবে করা হবে।

**তাওহীদ ও একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম হুকুম নামায**

এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, ফরয নামায হিসেবে পাঁচ ওয়াক্তের পূর্ণতা মেরাজ রজনীতে হয়েছে। তবে মেরাজের পূর্বেও কোনো নামায ফরয ছিলো কিনা, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। অগ্রগণ্য মতানুসারে নবুয়তপ্রাপ্তির পর (তথা মেরাজের পূর্বে) সর্বপ্রথম হুকুম হিসেবে নবীজী এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর দুই ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। দিবসের শুরুতে (সুবহে সাদেকের পূর্বে) দু'রাকআত এবং দিবসের শেষে (সূর্যাস্তের পূর্বে) দু'রাকআত তথা, ফযর ও আসরের নামায। মেরাজের রজনীতে এ ফরয নামাযের সংখ্যা পাঁচ-এ উন্নীত করা হয়। কাজেই উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর সর্বপ্রথম ফরয হুকুম হলো নামায।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا والله أعلم

'নবুওয়াতের শুরুলগ্নে মৌলিকভাবে নামায ফরয ছিলো (দু'ওয়াক্ত। যথা :) সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের আগে। হিজরতের দেড় বছর পূর্বে মেরাজের রজনীতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং পর্যায়ক্রমে তার শর্তসমূহ, রুকনসমূহ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ ফরয করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা হা-মীম সাজদা-৬)

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,[১]

وقد مر أن صلاة الفجر والعصر عندي كانت فريضة قبل المعراج أيضا كما ذهب إليه جماعة، وأما في المعراج فتكاملت خمسا.

( وقال فى موضع اخر ) واتفق الكل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما قبل الإسراء، وإنما تكلموا في صفتهما هل كانت فريضة أو تطوعا.فذهب جماعة إلى فرضيتهما وهو الذي أختاره،

'এ বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমার মতে মেরাজের পূর্বে ফজর ও আসর নামায ফরয ছিলো, যেমনটি উলামায়ে কেরামের একটি জামাআতের মত রয়েছে। পরবর্তীতে মেরাজে নামায পাঁচ ওয়াক্ত পূর্ণতা লাভ করে।

(অপর এক স্থানে তিনি বলেন,) সকলের মতেই নবীজী মেরাজের পূর্বে ফজর ও আসর নামায আদায় করতেন। তবে এ দুই ওয়াক্ত নামায ফরয ছিলো নাকি নফল এ বিষয় মতবিরোধ রয়েছে। উলামায়ে কেরামের এক জামাআতের মতে তা ফরয ছিলো। আমার নিকট এ মতটিই গ্রহণযোগ্য।' (ফয়যুল বারী ২/১০৩,২৪৩)

হযরত জিবরাইল আ. দুইবার নবীজীকে নামায শিক্ষা দেন। এক. নবুয়তপ্রাপ্তির পর দুই ওয়াক্ত নামাযের। এ সময়ে নবীজীকে উযূ করার পদ্ধতিও শিক্ষা দেয়া হয়। দুই. মেরাজ রজনীর পরবর্তী সকালে। এ সময় জিবরীল আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহকে সামনে রেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তার শুরু ও শেষ ওয়াক্ত নবীজীকে শিক্ষা দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/২৬)

**সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ**

ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আলো সর্বপ্রথম যার অন্তরকে আলোকিত করে, তিনি হলেন নবীজীর প্রিয় সহধর্মীনী হযরত খাদীজা রাযি.। (তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৪১৯)

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রাযি.-এর পর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্য হতে হযরত আবূ বকর রাযি., গোলামদের মধ্য হতে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি., বালকদের মধ্য হতে নবীজীর চাচাতো ভাই হযরত আলী রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আবূ বকর রাযি. কুরাইশদের বংশ পরম্পরা জ্ঞান সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী এবং অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের অধিকারী সুহৃদ ব্যক্তিত্ব হওয়ার পাশাপাশি নবীজীর আন্তরিক বন্ধু ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলেন–

ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم

'যাকেই আমি ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছি, সে-ই কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়েছে। তবে আবূ বকর ব্যতীত, তিনি ইসলাম

---

১. মেরাজের পূর্বে নামায ফরয থাকার বিষয়টি বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত রেওয়ায়েত এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনা দেখা যেতে পারে-

(ক) মুস্তাদরাকে হাকিম; হা.নং ৪৫৮৬

قال الحاكم : صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. (التعليق – من تلخيص الذهبي) – صحيح

(খ) মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭৪৮০

قال شعيب الأرنؤوط فى تعليقه على مسند أحمد : حديث ضعيف، فى إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ، وقد اضطرب في إسناده ومتنه

(গ) [সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৪৯], [মুস্তাদরাকে হাকিম; হা.নং ৪৮৪২], [মু'জামুল কাবীর লিত্ তবরানী; হা.নং ৪৬৫৭],

(ঘ) ইবনে রজব হাম্বলী রহ., ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী; ২/৭৯-৮১

(ঙ) হাফেয ইবনে হাজার আসকলানী রহ., ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী; ২/ ২১৭

باب كيف رضت الصلاة فى الاسراء–باب المعراج– باب قوله "سورة قل أوحى"

(চ) আল্লামা আইনী রহ., নুখাবুল আফকার; ৪/৬-৭

(ছ) ইউসুফ বিন্নুরী রহ., মাআরিফুস সুনান; ২/৭-৮

গ্রহণে কিছুমাত্র দ্বিধা করেনি। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা হুদ-২৫, তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৮৩)

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আবু বকর রাযি. নিজ ঘনিষ্ঠজনদের মধ্য হতে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান শুরু করেন। ফলে হযরত উসমান রাযি., হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম , আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি., তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযি., সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. তার হাতেই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। (তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৮৪, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩১)

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. নবীজীর গোলাম ছিলেন। নবীজী তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর হযরত আলী রাযি. নবীজীর প্রতিপালনে থাকাকালীন মাত্র মাত্র ১০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। নিঃসন্দেহে এ সকল নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণ নবীজীর সত্যবাদিতার অন্যতম প্রমাণ! (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩১, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৮৪, আস সীরাতুন নববিয়্যাহ ১৮৩)

তিন বছর ব্যাপী এ গোপন দাওয়াতী কার্যক্রম চলাকালীন যারাই ইসলাম গ্রহণ করতেন নবীজী তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখার পরামর্শ দিতেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আমর ইবনে আবাসা রাযি. ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কী বিষয় দিয়ে প্রেরণ করেছেন?' নবীজী জবাবে বললেন,

أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء

'আল্লাহ তা'আলা আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মূর্তি ধ্বংস করা, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া (এবং) তার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা (-এর নির্দেশনা) দিয়ে পাঠিয়েছেন।'

এরপর যখন আমর ইবনে আবাসা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং প্রকাশ্যে নবীজীর অনুসরণ ও আনুগত্যের মিনতি জানালেন, তখন নবীজী তাকে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশনা দিয়ে বললেন, ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني

'বরং তুমি তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাও। যখন আমার নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ তোমার শ্রুতিগোচর হবে, তখন আমার নিকট চলে এসো।' (মুসলিম শরীফ; হা.নং ৮৩২)

ইসলামের সত্যতার উদাহরণ হিসেবে এ তিন বছরে চল্লিশজনেরও অধিক সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। হাফেয যাহাবী রহ. তার 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে (১/৮৪-৮৫) তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

**মুসলমানদের প্রথম জমায়েতস্থল : সাহাবী হযরত আরকাম রাযি.-এর ঘর**

তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াতে ধীরে ধীরে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, তখন মুসলমানদের জমায়েতের জন্য সাফা পাহাড়ের উপর অবস্থিত হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম রাযি.-এর ঘরকে নির্বাচন করা হলো। এ ঘরে জমায়েতকালেই চল্লিশতম মুসলমান হিসেবে হযরত উমর ফারূক রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ফলে তখন মুসলমানগণ সুবিধামত স্থানে জমায়েত হতেন। (আল ইসাবা; আরকাম ইবনে আবিল আরকাম রাযি.-এর জীবনী দ্রষ্টব্য, সীরাতে মুস্তফা১/১৬৭)

**প্রকাশ্যে দাওয়াতের সূচনা**

কাযী সুলাইমান মনসূরপুরী রহ. তার বিখ্যাত সীরাতগ্রন্থ 'রাহমাতুল্ লিল আলামীন'-এ [পৃ. ৭৮] উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে দাওয়াতের যে গুরুদায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, মৌলিকভাবে তা পাঁচ স্তরে বিভক্ত ছিলো–

১. আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত প্রদান।

২. নিজ জনপদ তথা মক্কার লোকদেরকে দাওয়াত প্রদান।

৩. মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে দাওয়াত প্রদান।

৪. সমগ্র আরবে দাওয়াত প্রদান।

৫. সমগ্র পৃথিবীতে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

**আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত প্রদান**

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যখন পবিত্র কুরআনে কারীমের আয়াত وأنذر عشيرتك الأقربين নাযিল হলো, তখন নবীজী কুরাইশদেরকে একদিন খানার দাওয়াত প্রদান করলেন।[1] এরপর নবীজী তাদেরকে নিম্নলিখিত ভাষায় তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান করলেন–

يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا، إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها

'হে কুরাইশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! হে কা'ব ইবনে লুওয়াই গোত্র! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! হে আবদে মানাফ গোত্র! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! হে হাশেম গোত্র! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! হে আব্দুল মুত্তালিব গোত্র! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! আল্লাহর কসম! আল্লাহর মুকাবেলায় আমি তোমাদের কোনো কাজে আসবো না। তবে তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, যা (দুনিয়াতে) আমি রক্ষা করবো।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ[2]; হা.নং ১৪১১০, মুসনাদে আহমাদ[3]; হা.নং ৮৭২৬)

**মক্কার লোকদেরকে দাওয়াত প্রদান**

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সূত্রে এসেছে– (খানার মজলিসে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত প্রদান করার পর) নবীজী একদিন সাফা পাহাড়ে আরোহন করেন। এরপর তাদেরকে يا صباحاه 'ইয়া সাবাহা' বলে আহ্বান করেন। শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা হলে এভাবেই মক্কার লোকেরা পরস্পরকে আহ্বান করতো। ফলে তৎক্ষণাৎ সবাই সতর্ক হয়ে যেতো। নবীজীর এ আহ্বান শোনামাত্র মক্কার লোকেরা সাফা পাহাড়ের

---

১. হযরত আলী রাযি.-এর সূত্রে অপর বর্ণনায় রয়েছে, নবীজীর আদেশক্রমে হযরত আলী রাযি. আমন্ত্রিত চল্লিশোর্ধ মেহমানের জন্য একটি বকরীর পা, এক সা' আটার রুটি এবং এক পেয়ালা দুধের ব্যবস্থা করলেন! অথচ আমন্ত্রিত মেহমানদের মধ্যে ন্যূনতম দশজন এমন ছিলেন, যারা এককভাবে একটি বকরী খেয়ে ফেলতে সক্ষম ছিলেন! অথচ সকল মেহমান পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পরও খানা সামান্য হ্রাস পেল না; বরং আগের মতই রয়ে গেলো।

(২) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(৩) قال الهيثمي : رواه البزار واللفظ له، وأحمد باختصار، والطبراني في الأوسط باختصار أيضا، ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة.

পাদদেশে সমবেত হয়ে গেলো। এরপর নবীজী তাদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন- أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، تريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟ " قالوا: نعم قال: " فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد

'যদি আমি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, এই পাহাড়ের পেছনে একটি অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত, তবে এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী? তোমরা কি আমাকে সত্যায়ন করবে?' তারা বললো, 'হ্যাঁ'। নবীজী তাদেরকে বললেন, 'তবে শোনো! আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাবের ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করছি!' নবীজীর এ দাওয়াত শুনে কাফের আবু লাহাব নবীজীকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'ধ্বংস হোক তোমার সারাদিন! এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছো?' আবু লাহাবের এ হঠকারিতার পর কুরআনে কারীমের এ আয়াত নাযিল হয়– تبت يدا أبي لهب وتب অর্থাৎ আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং বিনষ্ট হোক। (সূরা লাহাব-১, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৮০১ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين, তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা শুআরা- ২১৪, ফাতহুল বারী; কিতাবুত তাফসীর; অধ্যায় وأنذر عشيرتك الأقربين)

**মসজিদে হারামে তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত!**

ইসলাম প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর নবীজী সর্বত্র তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। একদিন নবীজী মসজিদে হারামে উপস্থিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে একত্ববাদের ঘোষণা করলেন– قولوا لا إله الا الله تفلحوا 'হে লোকসকল! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তাহলে সফলকাম হবে।' এ কথা শোনামাত্রই চারদিক থেকে কাফেররা নবীজীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাহাবী হযরত হারেস ইবনে আবী হালা রাযি. নবীজীর সুরক্ষায় এগিয়ে গেলেন। কাফেরদের আঘাতের প্রচণ্ডতা থেকে নবীজী রক্ষা পেলেও সাহাবী হারেস রাযি. শাহাদাত বরণ করেন! এভাবে তিনিই হলেন পুরুষ সাহাবীদের মধ্য হতে ইসলামের প্রথম শহীদ! (আল ইসাবা; হারেস ইবনে আবী হালা রাযি.-এর জীবনী)

**জনসমাগমে তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত!**

কাফেরদের বিরোধিতা এবং অসন্তোষ সত্ত্বেও নবীজী অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে প্রত্যেক জনসমাগমে তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। সাহাবী হযরত রবীআ ইবনে আব্বাদ রাযি. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলী যামানার কথা বর্ণনা করেন যে, 'জাহেলী যামানায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'জুল মাযায' বাজারে এ ঘোষণা করতে শুনেছি যে, 'হে লোকসকল! তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে!' লোকেরা আশ্চর্য হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরতো। ট্যারা চোখ বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তার পেছন পেছন চলতো এবং (শ্রোতাদেরকে) এ কথা বলতো, '(হে লোকসকল!) এ ব্যক্তি ধর্মচ্যুত! মিথ্যাবাদী!' আমি উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলল, সে হল আবূ লাহাব!' (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৯০০৫ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره)[১]

**কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন এবং মুসলমানদের ঈমানী দৃঢ়তা!**

ইসলাম প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর শুরু হয়ে যায় সত্য ও অসত্যের প্রকাশ্য লড়াই। শুরু হয় মুসলমানদের উপর কুরাইশ কাফেরদের অবর্ণনীয় নির্যাতন। মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় (হা.নং ৩৮৩২) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর সূত্রে এসেছে, সর্বপ্রথম যে সকল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মক্কার কাফেরদের সম্মুখে নিজ ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করেন, তারা হলেন সাতজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, আম্মার এবং তার মাতা সুমাইয়া, সুহাইব, বেলাল, মিকদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)। নবীজী ও আবূ বকর উভয়কে আল্লাহ তা'আলা আপন আপন গোত্রের মাধ্যমে হেফাজত করেন। (অর্থাৎ ইসলামের সূচনালগ্নে। অন্যথায় চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর নবীজীও কাফেরদের অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন।) অন্যান্যদেরকে কাফেররা লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে (বালুর মধ্যে) শুইয়ে রাখতো...! আবু জাহল হযরত সুমাইয়া রাযি.-এর লজ্জাস্থানে বর্শা দ্বারা আঘাত করে তাকে শহীদ করে দেয়। এভাবে মহিলা সাহাবীদের মধ্যে হযরত সুমাইয়া রাযি. সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন! (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৩৮৩২, قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৩৬৯২০, আল ইসাবা; সুমাইয়া রাযি.-এর জীবনী)

**কাফেরদের বিরোধিতার কারণ**

মক্কার ভূমিতে যখন শত বছরের জাহালত ও মূর্খতার বিপরীতে তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত উচ্চকিত হলো, তখন যাদের অন্তঃকরণ পূর্ব হতেই সত্যান্বেষী ছিলো, অপসংস্কৃতির অভিশাপ থেকে যারা ছিলো বিমুক্ত, তারা সহজেই সত্যের এ দাওয়াতকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করলো। এর বিপরীতে শত বছরের অজ্ঞতা এবং অপসংস্কৃতির অভিশাপে যাদের প্রকৃতি ও সত্যগ্রহণের মানসিকতা দূরীভূত হয়ে গিয়েছিলো তারা হঠকারিতার পথই বেছে নিলো এবং সর্বান্তঃকরণে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় লিপ্ত হলো। সীরাতলেখকগণ কাফেরদের এ ইসলাম বিরোধিতার বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি এই–

১. ইসলামের এ দাওয়াত তাদের পূর্ব-পুরুষদের মতাদর্শের বিরোধী ছিলো।

২. ইসলামের এ দাওয়াত গ্রহণ করলে (তাদের ধারণা অনুযায়ী) সমগ্র আরবে কুরাইশদের আধিপত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিলো।

৩. ইসলামের এ দাওয়াত গ্রহণ করলে অনৈতিক চরিত্রের বিকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হতো।

৪. ইসলামের এ দাওয়াত গ্রহণ করলে তাদের শত বছরের মা'বুদ [মূর্তি]-দেরকে পরিত্যাগ করতে হতো, যা তাদের নিকট অসম্ভব ছিলো। (শিবলী নু'মানী রহ., সীরাতুন্নাবী ১/১৪১-১৪৪)

এ সকল কারণে কাফেরদের ইসলাম বিরোধী হওয়া বরং এর শত্রুতায় লিপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিলো। এমনকি এর প্রত্যেকটি কারণ এমন ছিলো, যদ্দরুন সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়াও অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও কুরাইশরা মুসলমানদেরকে জুলুম-নির্যাতন করলেও নবীজীকে হত্যা করার সাহস পাচ্ছিলো না। কেননা, এতে নবীজীর গোত্র বনু হাশেমের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় তো ছিলই উপরন্তু ক্রমান্বয়ে সমগ্র আরবে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ারও আশংকা ছিলো । (শিবলী নু'মানী রহ. কৃত সীরাতুন্নাবী ১/১৪৪)

**(২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

১. মুসনাদে আহমাদের অপর বর্ণনায় [হা.নং ১৬০২৪] রয়েছে যে, يطوف على الناس بمنى في منازلهم অর্থাৎ নবীজী মিনায় লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাওয়াত দিচ্ছিলেন!

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

**সৌরভ আহমাদ**
**নারায়ণগঞ্জ**

**৩৪২ প্রশ্ন : (ক)** মৃত্যুর পর লাশ স্থানান্তরিত করার বিধান কী? স্থানান্তরিত করলে কি গুনাহ হবে? কতদূর নিয়ে গেলে স্থান পরিবর্তন বলে গণ্য হবে? হাসপাতাল ইত্যাদি স্থানে নেয়ার সময় পথে মারা গেলে কী করবে? বাড়ি দূরে হলে বাড়িতে আনতে পারবে কি?

**(খ)** মায়্যিতের গোসলের সময় উযূ করানোর বিধান কী? এই উযূতে কি সুন্নাতগুলোরও পাবন্দী করতে হবে, না শুধু ফরযগুলো আদায় করে দিলেই যথেষ্ট হবে?

**(গ)** কোন কোন স্থানে বহু পুরাতন লাশ অবিকল পাওয়া যায়। আর দশ/বারো বছর পর লাশ মাটি হয়ে যায় বলে কবর মিটিয়ে দেয়া জায়েয বলা হয়। এজন্য বাস্তবেই তা মাটি হয়েছে কিনা জানার জন্য কবর খুঁড়ে দেখার প্রয়োজন আছে কি?

**(ঘ)** জানাযার নামাযের আগে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বা বিভিন্ন কিতাবে যে আরবী নিয়ত আছে তা বলা বিদআত হবে কি? জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

**উত্তর : (ক)** মৃত ব্যক্তিকে দাফনের উদ্দেশ্যে এক শহর থেকে আরেক শহরে স্থানান্তর করার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ মাকরূহে তানযীহী বলেছেন, আবার কেউ কেউ মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন। এজন্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া লাশ স্থানান্তর করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অবশ্য গোরস্থান যদি এক/দুই মাইল দূরে হয় তাহলে সেখানে নিয়ে যেতে অসুবিধা নেই। কেননা গোরস্থান সাধারণত এতটুকু দূরে হতে পারে। আর লাশ একবার দাফন করার পর শরয়ী কারণ ছাড়া স্থানান্তর করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয।

হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা গেলে বা হাসপাতালে মারা গেলে বাড়িতে নিতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা হাসপাতাল এলাকায় কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা অনেকটাই কঠিন। পক্ষান্তরে বাড়িতে এনে কাফন-দাফন করা অনেক সহজ। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১০৫৫, শরহুস সুন্নাহ লিল-বাগাবী ৫/৪৬৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৬৭, ফাতাওয়া শামী ২/২৩৯, দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম ১/১৬৭, আল-বাহরুর রায়িক২/২১০, ফাতাওয়া উসমানী ১/৫৭২, ৫৭৭, ৫৭৮, তুহফাতুল আলমাঈ শরহু সুনানিত তিরমিযী ৩/৪৭০)

**(খ)** মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় উযূ করানো সুন্নাত। এই উযূতে ফরযসমূহ আদায় করালেই চলবে। তবে কোন কোন আলেম বলেন, গোসলদাতা হাতের আঙ্গুলে পাতলা কাপড় পেঁচিয়ে মৃত ব্যক্তির দাঁত, ঠোঁট ও নাকের ছিদ্রে মাসাহ করিয়ে দিবে। জুনুবী এবং হায়েযা ও নেফাসগ্রস্ত মহিলার ক্ষেত্রেও একই কথা অর্থাৎ তাদেরকেও কুলি করানো ও নাকে পানি দেয়া জরুরী নয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ১০৮৯৯, আল-মাবসূত লিস-সারাখসী ২/৫৯, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/১৫৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৫৮, ফাতাওয়া শামী ২/১৯৫, বাদায়িউস সানায়ে’ ১/৩০০, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৪৭, ২৪৮)

**(গ)** যদি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে জানা যায় যে, কবরের লাশ মাটির সাথে মিশে গেছে তাহলে কবর খনন করে দেখার প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজনে ঐভাবেই তা মিটিয়ে দিতে পারবে বা সে জায়গায় অন্য মাইয়িতকে দাফন করতে পারবে। আর যদি কবর খনন করার পর লাশ অবিকল বেরিয়ে আসে তাহলে সেখানেই দাফন করে রাখবে। আর হাড্ডি বেরিয়ে আসলে সেগুলো মাটিসহ একত্রে দাফন করে দিবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৩৩, ২৪৫, ফাতহু বাবিল ইনায়া বিশরহিন নিকায়া ২/৬১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/৩৫১, ইমদাদুল আহকাম ৫/২৩২, ২৩৩, ২৮৯)

**(ঘ)** জানাযার নামাযের নিয়ত মনে মনে করলেই হবে; মুখে করা জরুরী নয়। হ্যাঁ, মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। নিয়ত এভাবে করবে, আমি আল্লাহ তা‘আলাকে খুশি করার জন্য মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আর উদ্দেশ্যে জানাযার নামায আদায় করছি। আর বিভিন্ন কিতাবে যে নিয়ত পাওয়া যায় তা বাংলা নিয়তেরই আরবী সংকলন। এগুলো শরীয়ত মতে মোটেও আবশ্যক নয়। (ফাতাওয়া শামী ১/৪১৫, ৪২৩, মাজমাউল আনহুর ১/৮৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৯১, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ১০/৩৭)

**মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান**

**৩৪৩ প্রশ্ন :** ঈদের নামাযের সালাম ফেরানোর পর আগে খুতবা পরে মুনাজাত, নাকি আগে মুনাজাত পরে খুতবা? কোনটি উত্তম? কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জানালে উপকৃত হবো।

উল্লেখ্য, আগে মুনাজাত হলে অনেকেই খুতবা না শুনে চলে যায়।

**উত্তর :** ঈদের নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দু‘আ করার বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু নামাযের পরপর দু‘আ করা হবে, নাকি খুতবার পর– এ ব্যাপারে দুই ধরণের মতামত পাওয়া যায়। এক. নামায শেষ করে সালাম ফেরানোর পরপরই দু‘আ করা। দুই. সালাম ফেরানোর পর আগে খুতবা দেয়া, তারপর দু‘আ করা।

তবে যেহেতু নামাযের পর দু‘আ কবুল হওয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ আছে, এ কারণে নিকট অতীতের ফকীহগণ খুতবার পূর্বে দু‘আ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, কাসেম নানুতবী, ইয়াকুব নানুতবীসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এর উপরই আমল করতেন।

অবশ্য ঈদের নামাযের পর খুতবা প্রদান করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। বিনা ওযরে স্থান ত্যাগ করা গুনাহ। পক্ষান্তরে খুতবা কানে পৌঁছলে তা শোনা ওয়াজিব। খুতবা চলাকালীন কথা বলা নাজায়েয। যদি নামাযের পর মুনাজাতের দ্বারা মুসল্লীগণ চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে খতীব সাহেব ঈদের দিনের বিভিন্ন বদরসমের (ব্যাপকভাবে মুআনাকা, মুসাফাহা করা ইত্যাদি) ব্যাপারে বয়ান করার পাশাপাশি খুতবার বিষয়টিও বয়ান করে দিবেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ মুসল্লীগণ খুতবা না শুনে চলে যাবে না।

(সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৪৯৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৯১৩৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫৬৪, ফাতাওয়া উসমানী ১/৪০২, কিফায়াতুল মুফতী ৩/২৫১, বেহেশতী যেওর; পৃষ্ঠা ৫৬১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১২৫, ফাতাওয়া বায়্যিনাত ২/৩০৮-৩১১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/১৪২, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ৯/৫২০)

**মুহাম্মাদ মশিউর রহমান**
**হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা**

**৩৪৪ প্রশ্ন :** আলমনগর (সুগন্ধা হাউজিং) মসজিদটি তিন তলা বিশিষ্ট। মসজিদের উত্তর পূর্বকোণে মসজিদে প্রবেশের প্রধান গেইট। মসজিদ কমিটি মসজিদের বাইরের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে আলাদা সিঁড়ি বানিয়ে দ্বিতীয় তলার একপার্শ্বে পারটেক্স বোর্ডের মাধ্যমে আড়াল সৃষ্টি করে মহিলাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছে। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত পন্থায় মসজিদের ভেতর মহিলাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করা হলে কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে কোন সমস্যা হবে কি?

**উত্তর :** কুরআনে কারীমে মহিলাদেরকে ঘরের অন্দর-মহলে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। এমনকি নামাযের জন্যও মসজিদে যেতে নিরুৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের জন্য নিজ ঘরের অন্দরমহলে খাস-কামরায় নামায পড়ায় বহুগুণ সওয়াব।

ইসলামী শরীয়তের আলোকে বর্তমানে মসজিদের জামাআতে শরীক হয়ে মহিলাদের নামায আদায় করা বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য সকল উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় অনেকগুলো শর্তের সাথে মহিলাদের জন্য মসজিদে আসার অনুমতি থাকলেও বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলারা তাদের ঘরেই নামায পড়বে। এটাই তাদের নামাযের জন্য সর্বোত্তম স্থান।

বর্তমান যামানা চরম ফেতনা-ফাসাদের যামানা। এ সময় নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়া একদম নিরাপদ নয়। পুরুষের নামাযের স্থান যেমন মসজিদ তেমনি মহিলাদের নামাযের স্থান তার ঘরের অন্দরমহল। সুতরাং কমিটি কর্তৃক মহিলাদের জন্য মসজিদে নামাযের ব্যবস্থা করা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ, যা বিলকুল বর্জনীয়। এভাবে মসজিদের ভেতর মহিলাদের জন্য নামাযের স্থানের ব্যবস্থা করা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর।

অবশ্য বিমানবন্দর, জংশন, স্টেশন, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থান তথা ভ্রমণসংশ্লিষ্ট এ জাতীয় স্থানে মসজিদের কাছাকাছি মুসাফির মহিলাদের জন্য উযূ ও পর্দার ব্যবস্থা সম্বলিত নামাযের স্থানের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। যেন মুসাফির মহিলারা সেখানে ইস্তিঞ্জা-উযূ সেরে একাকী নামায পড়ে নিতে পারে। (সূরা নিসা- ১০৩, সূরা আহযাব- ৩৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৬৯, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৫৭০, সহীহ ইবনে খুযাইমা; হা.নং ১৬৮৯, আহকামুল কুরআন লিত-থানবী ৩/৩১৮, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৬৬৩, ৬৬৮, ফাতাওয়া শামী ১/৫৬৫, ৫৬৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৮৩)

**পক্ষে মুহাম্মাদ ইরফান**
**স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

**৩৪৫ প্রশ্ন :** আমার বাবার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আমার ছোট এক ভাই এবং মা আছেন। বাবার রেখে যাওয়া কিছু জমি আছে। আমার চার ছেলে। আমি জানতে চাই, আমার ছেলেরা কি আমার বাবার জমি থেকে মীরাস পাবে?

আমি কি আমার অংশ ছেড়ে দিলে বা না নিলে গুনাহগার হবো? পূর্বে দু'বার আমাদের জমি বিক্রয় হয়েছে, তখন আমি কোন টাকা নিইনি। এখন এ বিষয়ে জানালে উপকৃত হবো।

উল্লেখ্য, আমার স্বামী বলেছেন, আমাদের ছেলেরা নাকি আমার বাবার জমির হকদার। এটা কি সঠিক?

**উত্তর :** প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে আপনার বাবার জমিতে ফারায়েয অনুপাতে হকদার আপনি, আপনার ভাই ও আপনার মা। আপনার ছেলেরা উক্ত জমির হকদার নয়। তবে উক্ত জমিতে আপনার যে প্রাপ্য অংশ আছে, আপনার ইন্তেকালের পর আপনার ছেলেরা আপনার সূত্রে তাতে হকদার হবে। সুতরাং আপনার স্বামীর কথা উল্লিখিত ব্যাখ্যাসাপেক্ষে হলে সঠিক; অন্যথায় নয়।

আর যেহেতু আপনার বাবার পরিত্যক্ত জমিতে আপনার প্রাপ্য অংশটুকু আপনার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার। এ অধিকার আপনি ছেড়ে দিতে বা না নিতে চাইলেই তা বাতিল হয়ে যাবে না, এজন্য আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত তার মালিকানা বুঝে নিয়ে তাতে হস্তক্ষেপ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে আপনার হক আপন অবস্থায় বহাল থাকবে এবং হেবা করলে বা অংশ ছেড়ে দিলে তা সহীহ হবে না এবং অন্যরা তার মালিক হতে পারবে না। তাই আপনি যদি আপনার অধিকারভুক্ত অংশ আপনার মা বা ভাইকে হেবা করতে চান তাহলে তা একমাত্র হস্তগত করার পরে করতে পারবেন। অথবা এওয়ায-বদলের মাধ্যমে করতে পারবেন। আর পূর্বে যে জমি বিক্রি করা হয়েছে এবং বর্তমানে যে জমি আছে সব মিলিয়ে আপনার মোট অংশ আপনি বুঝে নিবেন। তারপর আপনি চাইলে যে কোনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

আর আপনার হেবা করা যদি নেক উদ্দেশ্যে হয় এবং এতে আপনার সংসারে কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা হেবা করলে কোন অসুবিধা নেই। এতে আপনার কোন গুনাহ হবে না। (সূরা নিসা- ১১, সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৭৩২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৬১৫, আস-সিরাজী ফিল-মীরাস; পৃষ্ঠা ৭, আল-বাহরুর রায়িক ৭/২৮৬, ফাতাওয়া শামী ৫/৬৮৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৭/৫০৩)

**মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মাসরুর**

**৩৪৬ প্রশ্ন :** আমার বাড়িতে একব্যক্তি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতো। একদিন পুলিশ এসে দরজা ভেঙ্গে তাকে ধরে নিয়ে যায়। জানা গেছে, সে মাদক ব্যবসায়ী ছিলো। এলাকায় কেউ তাকে চিনে না। পুলিশ তাকে কোথায় নিয়ে গেছে তা-ও জানা নেই। উক্ত ফ্ল্যাটে তার কিছু মাল-সামানা আছে। তার কারণে পুলিশ কর্তৃক আমার ফ্ল্যাটটিতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রশ্ন হলো, আমি তার মাল-সামানা বিক্রয় করে ক্ষয়ক্ষতি ও ভাড়া উসূল করতে পারবো কি না? আর বিক্রয় করতে না পারলে, কতোদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? জানালে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** বাড়ির মালিক প্রথমে ভাড়াটিয়া অথবা তার পরিবারের ঠিকানা অনুসন্ধানের ব্যাপারে সাধ্যমতো চেষ্টা করবে এবং পেলে তাদের শরণাপন্ন হবে। কোন উপায়েই যদি তার অথবা তার পরিবারবর্গ বা অভিভাবকের সন্ধান

পাওয়া না যায়, তাহলে বাড়ির মালিক ভাড়াটিয়ার রেখে যাওয়া আসবাব-পত্র বিক্রয় করে বাড়ির ভাড়া ও ক্ষয়ক্ষতির সমপরিমাণ টাকা উসূল করতে পারবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৪২৫৬, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল-আসার ২/৩৭৩, আল-মাবসূত লিস-সারাখসী ১১/১২৮, ১৬/১৭১, আল-মুহীতুল বুরহানী ৭/৪০০, ফাতাওয়া আলমগীরী ৪/৫২৫, ফাতাওয়া শামী ৪/৯৫, ৬/৪২২, কিফায়াতুল মুফতী ৪/১৪০)

**মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান**
**সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

**৩৪৭ প্রশ্ন :** আমি একটি কোম্পানিতে কাজ করি। আমার কাজ হলো, ফটো এডিটিং বা ছবির কাজ। এতে মহিলা মডেলের ছবিতে কাজ করতে হয়। কাজ হলো, মুখের তিল, ব্রন, ফাঁটা দাগ দূর করা, অমসৃণকে অংশকে মসৃণ করা, চেহারাকে সুন্দর করা, শরীরে কোন দাগ থাকলে তা পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এছাড়াও মাঝে মাঝে শুধু এমন পণ্যের কাজ করতে হয় যেখানে কোন ছবি থাকে না।

আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত কাজকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানানো বৈধ কি না? অথবা এর কোন বৈধ পদ্ধতি আছে কি না? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

**উত্তর :** গাইরে মাহরাম মহিলাকে সরাসরি দেখা যেমন হারাম, অনুরূপ তার ছবিও দেখা হারাম। ফটো বা ছবি তোলা নাজায়েয। আর ফটো এডিটিং ফটো তোলারই নামান্তর। সুতরাং ফটো এডিটিংও নাজায়েয। কারণ এতে ফটো তোলার কাজে সহযোগিতা করা হয়।

আপনি যেহেতু ফটো এডিটিংয়ের কাজ করেন, আর এ কাজ করতে গিয়ে মহিলা মডেলদের ছবির মুখের তিল, ব্রন, ফাঁটা দাগ, অমসৃণকে মসৃণ করা, চেহারাকে সুন্দর করা, শরীরের দাগ পরিষ্কার করা ইত্যাদি করে থাকেন। আর এ কাজ করতে গিয়ে যেমন ছবি তোলার কাজে সহযোগিতা হয়, তেমনি গাইরে মাহরাম মহিলার ছবি দেখার গুনাহ হয়।

সুতরাং জীবিকা উপার্জনের জন্য এ কাজ করা আপনার জন্য বৈধ নয়। তবে যে সমস্ত কাজে কোন প্রাণীর ছবি থাকে না, সে কাজ করতে কোন আপত্তি নেই। আপনার যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণীর ছবির কাজ করতে হয়, এজন্য এখন আপনার করণীয় হলো, সম্ভব হলে শুধু যে সমস্ত কাজে প্রাণীর ছবি নেই সেগুলোর কাজ করা অথবা অন্য কোন বৈধ পেশার ব্যবস্থা করা। আর যতদিন কোন বৈধ পেশার ব্যবস্থা না হয়, ততোদিন আল্লাহর নিকট তওবা-ইস্তিগফারের সাথে বর্তমান পেশা বহাল রাখুন এবং এখন থেকে বৈধ পেশার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকুন। (সূরা নূর- ৩০, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৪৬, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী ১০/২১৪, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৫৭৪, উমদাতুল কারী ১৫/১২৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/১৩০, ফাতাওয়া শামী ১/৬৪৭, ৬/৩৭০, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ২৪/৪৩৪)

**মাওলানা হুসাইন আহমাদ**
**মাওনা, গাজীপুর**

**৩৪৮ প্রশ্ন : (ক)** মেয়েদের জন্য বিউটি পার্লার থেকে ভ্রু চিকন করা জায়েয হবে কি?

**(খ)** পায়ে নুপুর ব্যবহার করার বিধান কী?

**(গ)** মেয়েদের জন্য সবসময় হাতে মেহেদীর আলামত রাখা কি উত্তম, নাকি মাঝে মধ্যে মেহেদী ব্যবহার উত্তম?

**উত্তর : (ক)** বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের সময় মেয়েদের ঘরে থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা। একান্ত ঠেকা ছাড়া বাইরে না যাওয়াই উচিত। যতটুকু সাজ-সজ্জা করার দরকার তা ঘরেই করবে। সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে বিউটি পার্লারে বেপর্দা-বদদীন মহিলাদের নিকটে যাওয়া জায়েয নেই। এ ব্যাপারে শরীয়তে কঠিন নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

আর মেয়েদের ভ্রু চিকন করা নাজায়েয। হাদীসে এ ব্যাপারে অভিশাপ করা হয়েছে। হ্যাঁ, যদি কারো ভ্রু বেশি মোটা এবং লম্বা হওয়ার কারণে বিশ্রী দেখায়, তাহলে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার অবকাশ রয়েছে। (সহীহ বুখারী ৭/১৬৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/২১১, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৫৮, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৫/৪৬৮)

**(খ)** শরীয়তের সীমা অতিক্রম না করে মেয়েদের সাজ-সজ্জা করার অনুমতি রয়েছে। যে সাজ-সজ্জা শরীয়ত পছন্দ করে না, তা অবশ্যই বর্জনীয়। শরীয়ত মেয়েদের অলঙ্কার ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। তারা চাইলে আওয়াজবিহীন নুপুরও ব্যবহার করতে পারবে। তবে হাঁটার সময় যে নুপুরে আওয়াজ হয়, তা ব্যবহার করা যাবে না। আওয়াজ হয় এমন অলঙ্কার ব্যবহার করতে হাদীসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। (সুনানে আবূ দাউদ ৪/৯১, ই'লাউস সুনান ১৭/২৯৪, ফাতাওয়া শামী ৬/৪২০, বেহেশতী যেওর ৩/৬২)

**(গ)** হাদীসের কিতাবে মেয়েদের হাতে মেহেদীর আলামত রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সুনানে কুবরার বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের হাতে মেহেদীর আলামত না থাকা অপছন্দ করতেন। মেহেদীর আলামত না থাকলে মেয়েদের হাত পুরুষের হাতেরও সদৃশ হয়ে যায়, যা শরীয়তে খুবই অপছন্দনীয়। এজন্য উলামায়ে কেরাম মেয়েদের হাতে মেহেদী ব্যবহার মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে, যে মহিলার স্বামী রয়েছে তার জন্য সবসময় হাতে মেহেদীর আলামত রাখা মুস্তাহাব। এ সমস্ত হাদীস ও মনীষীদের বাণী থেকে বুঝে আসে, যদি সম্ভব হয় তাহলে সবসময় হাতে মেহেদীর আলামত রাখা উত্তম। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে মাঝে-মধ্যে হলেও রাখা উচিত। (সুনানে আবূ দাউদ ৪/৭৭, সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী ৭/৫০৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৫৯, ফাতহুল মুনঈম শরহু সহীহিল মুসলিম ৫/১২৪)

**মুফতী রিযওয়ানুর রহমান**

**৩৪৯ প্রশ্ন :** বর্তমানে বাজারে এমন কিছু ব্যাগ পাওয়া যায়, যেগুলোতে সাপের চামড়া ব্যবহার হয়েছে। এসব ব্যাগ ব্যবহার করার বিধান কী?

**উত্তর :** সাপের চামড়া পরিশোধন করা গেলে তা পাক হয়ে যাবে। সুতরাং সাপের পরিশোধিত চামড়া ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত ব্যাগ ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/২৫, আল-বাহরুর রায়িক ১/২৪৩)

**মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান**
**পশ্চিম মণিপুর, মিরপুর, ঢাকা**

**৩৫০ প্রশ্ন : (ক)** আমার স্ত্রীর ছোট ভাইকে বছর দুই আগে মহিলা মাদরাসা পড়ুয়া এক ছাত্রীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন করানো হয়। আমার শাশুড়ী একজন দীনদার মহিলা। এজন্য তিনি উক্ত পাত্রীকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করেন এই ভেবে যে, যেহেতু মাদরাসায় পড়েছে, আলেম হয়েছে, তাই দীনদার, আমলওয়ালা, আখলাকওয়ালা পুত্রবধূ পাওয়া যাবে। যদিও উক্ত পাত্রীর ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ইত্যাদি

তাদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম ছিলো। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, শ্বশুর-শাশুড়ী নিজেদের বাসায় পুত্রবধূকে রেখেছেন। তার যাবতীয় ভরণ-পোষণ ও পুত্রের ভরণ-পোষণের সিংহভাগ তারাই দিচ্ছেন। কিন্তু উক্ত পুত্রবধূ শাশুড়ীর সাথে ছোট-খাটো বিষয়ে তর্ক-বেয়াদবীতে লিপ্ত হচ্ছে। বিভিন্ন আমল যেমন: কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, কিতাব পড়া ইত্যাদি ব্যাপারে তারা উৎসাহ দিলে উক্ত পুত্রবধূ বিরক্তি প্রকাশ করে এবং উদাসীনতা প্রদর্শন করে। ছোট ভাই মাঝে মাঝে তার স্ত্রীকে এসব বিষয়ে বুঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। শ্বশুরের বাসায় উক্ত পুত্রবধূর আচরণ নিয়ে সবাই পেরেশান। এমতাবস্থায় জানার বিষয় হলো, উক্ত পুত্রবধূকে আলাদা সংসার বুঝিয়ে না দিয়ে নিজেদের সাথে রাখাটা কি শরীয়তসম্মত হচ্ছে? উক্ত পুত্রবধূর সংশোধনের জন্য পুত্র ও শ্বশুর-শাশুড়ীর দায়িত্ব কী?

**(খ)** সুদী ব্যাংকে চাকুরী করে এমন ব্যক্তি যদি কোন চিকিৎসকের কাছ থেকে ফি পরিশোধ করে প্রেসক্রিপশন নেয় তাহলে উক্ত ফি-এর টাকা ব্যবহার করা কি উক্ত চিকিৎসকের জন্য হালাল হবে? যদি না হয় তাহলে করণীয় কী?

**(গ)** বিকাশ অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন সময় ইন্টারেস্ট দেয়া হয়। উদাহরণত তারা মোবাইলে এস.এম.এস দেয় যে, আপনি bKash-এ ৬.৯৪ টাকা ইন্টারেস্ট পেয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

**উত্তর : (ক)** প্রশ্নোল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা যতটুকু বোঝা যায়, পুত্রবধূটি নিজ শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে মিলেমিশে থাকতে প্রস্তুত নয় বা তার সে যোগ্যতা নেই। কাজেই এ পরিস্থিতিতে পৃথকভাবে থাকতে চাইলে তাকে আলাদা করে দেয়াই সর্বোত্তম কাজ হবে। এ পরিস্থিতিতে আলাদা সংসার না বুঝিয়ে নিজেদের সাথে থাকতে বাধ্য করা শরীয়তের কাম্য নয়।

আলাদা করে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, শ্বশুর-শাশুড়ী থেকে একেবারে পৃথক হয়ে যাবে; বরং আলাদা থেকেও শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত করা যায়। অতএব পুত্রবধূর উচিত সাধ্যমত তাদের সেবা-যত্নের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তারা কিভাবে তার প্রতি খুশি হয় এর ফিকির রাখা। এর দ্বারা সে উভয় জাহানে সফলকাম হবে। আর যে আচরণের দরুন তারা পেরেশান হয়েছে তার জন্য তওবা-ইস্তিগফার করা ও তাদের কাছে মাফ চাওয়া। (সূরা তালাক- ৬, ফাতাওয়া শামী ৩/৫৯৯, ৬০১, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৫/১৪৫, ১৬২)

পুত্রবধূর সংশোধনের ক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ীর চেয়ে পুত্রের সংশোধনী বেশি কার্যকরী হবে। সুতরাং ছেলের দায়িত্ব হলো, স্ত্রী স্বামীর শরীয়তসম্মত বিষয়ে আনুগত্য করতে না চাইলে স্বামী পর্যায়ক্রমিক পন্থায় তার সংশোধনের চেষ্টা করবে। প্রথমে তাকে আল্লাহর ভয় দেখাবে এবং আনুগত্যের লাভ ও অবাধ্যতার ক্ষতি সম্পর্কে দরদের সাথে বোঝাবে। তাতে কাজ না হলে তার বিছানা আলাদা করে দিবে। সর্বাবস্থায়ই উদ্দেশ্য থাকবে তাকে সংশোধন করা। সুতরাং সংশোধনের জন্য বৈধ পন্থাসমূহের মধ্য থেকে যে পন্থা বেশি ফলপ্রসূ মনে হয় সেটাই অবলম্বন করা উচিত। সংশোধন হয়ে গেলে কোন ছলে তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না এবং তার উপর স্বামীত্বের অহঙ্কার ফলানো যাবে না। তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবে এবং তার হিদায়াতের জন্য দু'আ করবে। এতে করে হয়তোবা তার বুঝে আসতে পারে এবং সে শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। (সূরা নিসা- ৩৪, ফাতাওয়া শামী ৩/২০৮, ফাতাওয়া উলামায়ে বালাদিল হারাম; পৃষ্ঠা ১৩৯১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/৪১, ৪৪)

**(খ)** সুদী ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক কাজে যে কোন পদে চাকরিজীবী ব্যক্তির বেতন শরয়ী বিধান মতে সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ। সুতরাং চিকিৎসকের জন্য জেনেশুনে এমন ব্যক্তিকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ফি বাবদ টাকা নিয়ে তা ব্যবহার করা হালাল হবে না; বরং এই টাকা কোন গরীব-মিসকীনকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে।

আর যদি চাকরিজীবী নিজ বেতনের টাকা না দিয়ে বরং কারো থেকে ঋণ নিয়ে ফি পরিশোধ করে তাহলে উক্ত টাকা ব্যবহার করা হালাল হবে।

উল্লেখ্য, ডাক্তার বা অন্যদের এটা যাচাই করা জরুরী নয় যে, ফি পরিশোধকারীর ইনকাম সোর্স কী? বরং মুসলমানদের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখবে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কারো ইনকাম হারাম হওয়ার ব্যাপারে জানা থাকলে ভিন্ন কথা। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১২৭৬, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৪৮৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/১৭৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৯৭, ফিকহুল বুয়ূ' ২/১০৬০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৭/৩৮২, ৩৮৫, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৯৫)

**(গ)** বিকাশ-সহ বিভিন্ন কোম্পানী মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে যে ইন্টারেস্ট দিয়ে থাকে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদ বলেই বিবেচিত হবে। আর সুদ নেয়া-দেয়া, সুদের সাক্ষী হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং ইন্টারেস্টের জন্য এ জাতীয় অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা জায়েয নেই। অন্য প্রয়োজনে রাখার পর যদি ইন্টারেস্ট আসে তাহলে এ টাকা হিসাব করে কোন গরীব-মিসকীনকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৫, ফাতাওয়া উসমানী ৩/২৬৮)

**মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান**
**কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা**

**৩৫১ প্রশ্ন :** জনৈক মহিলা ১২ই যিলহজ্জ হজ্জের ফরয তাওয়াফ আদায় করছিলো। প্রথম চক্কর আদায়ের পর তার উযূ ভেঙ্গে যায়। এরপর সে উযূ ছাড়াই তাওয়াফের শেষ তিন চক্কর আদায় করে। অতঃপর ঐ দিন সূর্যাস্তের পর তার হায়েয দেখা যায়। তারপর সে হায়েয অবস্থায় পূর্বের তিন চক্করের কাযা আদায় করে এবং বিদায়ী তাওয়াফ করে মদীনায় চলে যায়। অতঃপর সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করে দেশে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য, এর জন্য সে কোন দম বা সদকা আদায় করেনি। এখন জিজ্ঞাসা হলো, এ অবস্থায় তার ফরয তাওয়াফ কি আদায় হয়েছে? না হলে এখন তার করণীয় কী? আর এ কারণে কি তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে? হলে প্রত্যেকটির জন্য কি পৃথক পৃথক দম দিতে হবে, না উভয়টির জন্য একটি দম দিলেই যথেষ্ট হবে?

**উত্তর :** এ অবস্থায় তার ফরয তাওয়াফ আদায় হয়ে গিয়েছে। এ জন্য তার উপর দম ওয়াজিব হয়নি। তবে ফরয তাওয়াফের শেষ তিন চক্করের প্রত্যেক চক্করের জন্যে আধা সা' গম তথা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে। আর হায়েয অবস্থায় বিদায়ী তাওয়াফ করার কারণে একটি দম তথা একটি বকরী ওয়াজিব হবে, যা হারামের সীমানায় জবাই করতে হবে। তবে এর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, যে কোন সময় লোক মারফত হারামের সীমানার মধ্যে একটি বকরী জবাই করাতে হবে। (আল-বাহরুর রায়িক

৩/২০, ফাতাওয়া শামী ২/৫৫১, মানাসিকে মোল্লা আলী ক্বারী; পৃষ্ঠা ৩৫১, আল-বিনায়া ৪/৩৫৯, আল-মাবসূত লিশ-শাইবানী ২/৩৯৮, বিদায়াতুল মুবতাদী; পৃষ্ঠা ৫১, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৪৬৪, কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৫৭, আনওয়ারে মানাসিক; পৃষ্ঠা ৩৬৩)

**মুহাম্মাদ ফাহাদ**
**শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া**

**৩৫২ প্রশ্ন : (ক)** কেউ যদি বদলী হজ্জ করে তাহলে সে হজ্জে গিয়ে যে কুরবানী দিবে সেটা কার নামে দিবে?

**(খ)** তার কি দেশে কুরবানী দেয়া জরুরী? যদি জরুরী হয় তাহলে সেটা কার নামে দিবে?

**উত্তর : (ক)** বদলী হজ্জ আদায়কারী যদি হজ্জে ইফরাদ করে তাহলে তো সে ক্ষেত্রে কুরবানীই করতে হবে না। তবে যদি যার পক্ষ থেকে হজ্জ করছে তার অনুমতি সাপেক্ষে হজ্জে তামাত্তু বা কিরান করে তখন শুকরিয় হিসেবে যে কুরবানী ওয়াজিব হয় তা বদলী হজ্জ আদায়কারী নিজের নামেই করবে। কেননা এ কুরবানী সরেজমিনে হজ্জের কার্যক্রম আদায়কারীর সাথেই সম্পৃক্ত। তবে এ কুরবানীর সওয়াব প্রেরণকারীও পাবে।

উল্লেখ্য, বদলী হজ্জের ক্ষেত্রে উত্তম হলো, মীকাতী হজ্জ অর্থাৎ এমন হজ্জ করা যা মীকাত থেকে আরম্ভ করা হয়। আর তা হলো হজ্জে ইফরাদ। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৩০৪৯, বাদায়িউস সানায়ে' ৫/৬৮, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৪, ফাতাওয়া শামী ২/৬১০, আল-হিদায়া ১/১৭৯, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৬৫১, গুনইয়াতুন নাসিক; পৃষ্ঠা ৩৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫২৩, কিতাবুন নাওয়াযিল ৭/৬০৪)

**(খ)** বদলী হজ্জ আদায়কারী কুরবানীর দিনে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা এর সমমূল্যের নগদ অর্থ অথবা ব্যবসার পণ্য কিংবা প্রয়োজন অতিরিক্ত সামানা-পত্রের মালিক থাকে এবং সে মুকীমও হয় অর্থাৎ সেখানে নিম্নে পনের দিন অবস্থান করার নিয়ত করে তখন তার উপর কুরবানী করা জরুরী হয়। এ কুরবানী সে মক্কাতেও করতে পারে অথবা নিজ এলাকাতেও করাতে পারে। আর এ কুরবানী তার নিজের নামেই হবে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮২৭৩, ফাতাওয়া শামী ৬/৩১২, ৩১৬, তাবয়ীনুল হাকায়িক ৬/৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫২০)

**মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান**
**ঢাকা উদ্যান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

**৩৫৩ প্রশ্ন :** হিন্দুদের পূজায় দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্য বা কোন উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মাযারে, নদীতে বা অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হয়, যেগুলোকে স্থানীয় ভাষায় ভোগ বলা হয়, তা গ্রহণ করা এবং খাওয়া জায়েয আছে কি? যদি জায়েয হয়ে থাকে তাহলে কাদের জন্য খাওয়া জায়েয? মুশরিকদের ভোগ খাওয়া বৈধ কি না? ভোগ ও মান্নতের মধ্যে পার্থক্য কী? ভোগের আলামতযুক্ত কোন জীবিত ছাগল পাওয়া গেলে সেটা জবাই করে খাওয়ার বিধান কী?

**উত্তর :** মুশরিকদের ভোগ কারো জন্য খাওয়া জায়েয নয়। মুসলমানদের ভোগও যদি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা-ও কারো জন্য খাওয়া জায়েয হবে না।

ভোগ ও মান্নতের মধ্যে পার্থক্য হলো, ভোগ মানুষের মাঝে প্রচলিত একটি কুপ্রথা এবং তা সাধারণত গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর মান্নত যদি সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহর নামে হয়ে থাকে, তাহলে সেটা শরীয়তসম্মত একটি ইবাদত বলে গণ্য হয়। আর এ রকম মান্নতের খাদ্যবস্তু ফকীর-মিসকীন তথা গরীবরা খেতে পারে। তবে মান্নতও যদি ভোগের মতো গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে এই মান্নত প্রচলিত ভোগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে জবাই করা প্রাণী মূলত তিন প্রকার–

এক. জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা হয়।

দুই. জবাই করা হয় গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে, কিন্তু জবাই হয় আল্লাহর নামে।

তিন. গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রাণী ছেড়ে দেয়া হয়, কিন্তু জবাই উদ্দেশ্য হয় না।

**উপরোক্ত তিন প্রকার প্রাণীর বিধান**

প্রথম দুই প্রকার প্রাণী খাওয়া সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। তৃতীয় প্রকার প্রাণীও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী খাওয়া জায়েয নেই। তবে জবাই করার পূর্বে মালিক যদি তওবা করে আগের নিয়ত পরিবর্তন করে নেয় অথবা বিক্রয় করে দেয় বা কাউকে দান করে দেয়, তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার প্রাণী খাওয়া বৈধ হবে।

প্রশ্নে বর্ণিত ছাগল তৃতীয় প্রকার প্রাণীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ উক্ত ছাগল জবাই করে খাওয়া জায়েয নয়, (তবে জবাই করার পূর্বে মালিক যদি তওবা করে আগের নিয়ত পরিবর্তন করে নেয় অথবা বিক্রয় করে দেয় বা কাউকে দান করে দেয়, তখন সেটা খাওয়া জায়েয হবে। নতুবা) সেটা খাওয়া হারাম হবে। এর মূল্য মালিককে খুঁজে বের করে ফেরত দিতে হবে। একান্তই যদি মালিককে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে উক্ত ছাগলের মূল্য গরীবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। আর যদি ছাগলের গোশত ভক্ষণকারীরা নিজেরাই গরীব হয়, তাহলে তাদের জন্য মূল্য সদকা করা জরুরী নয়; তবে তওবা করা জরুরী। (সূরা বাকারা- ১৭৩, সূরা মায়িদা- ৩, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৮৭৫, আল-বাহরুর রায়িক ২/৩২০, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ৩১৯, ফাতাওয়া শামী ২/৪৩৯, ৬/৩০৯, তাফসীরে আযীযী ২/৯৪৪, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/৪৩৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/৫৬৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৫১, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৬/২৩৭, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৪৭৩)

**মাওলানা নোমান আহমাদ**
**শ্যামলী, আদাবার, ঢাকা**

**৩৫৪ প্রশ্ন : (ক)** জনৈক ব্যক্তি একটি জমি বিক্রয় করার ইচ্ছা করেছে। তা শুনে এক ব্যক্তি বললো, ঠিক আছে আমি এক হাজার টাকায় বিক্রয় করে দিবো। তবে এক হাজারের বেশি যা বিক্রয় করবো তা আমার হবে। পরে সে এক হাজার দুইশত টাকায় জমিটি বিক্রয় করে জমির মালিককে এক হাজার টাকা দেয়, আর দুইশত টাকা নিজে নিয়ে নেয়। এভাবে চুক্তি করে বিক্রয় করা এবং অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা কি জায়েয আছে?

**(খ)** যে মহিলার স্বামীর উপার্জন পুরোটাই হারাম এবং ওই মহিলার অন্য কোন হালাল উপার্জনের ব্যবস্থাও নেই, এমন মহিলা ও তার বাচ্চারা তার স্বামীর উপার্জন থেকে কতটুকু ভোগ করতে পারবে এবং এই মহিলা যদি তার স্বামীর উপার্জন থেকে কাউকে কোন কিছু হাদিয়া দেয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে কি?

**উত্তর : (ক)** শ্রমিকের শ্রমের বিনিময় তথা পারিশ্রমিক নির্ধারণ হওয়া লেনদেন সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত। দালালীর ব্যাপারেও একই বিধান। সুতরাং প্রশ্নোক্ত

লেনদেনে ‘এক হাজারের বেশি যা বিক্রয় করবো তা আমার হবে’ এভাবে চুক্তি করার দ্বারা পারিশ্রমিক নির্ধারণ হয় না। তাই উক্ত পদ্ধতিতে চুক্তি করা বৈধ নয়। বৈধভাবে করতে চাইলে নির্দিষ্ট অংক বা শতকরা হারে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে। (উমদাতুল কারী ১২/৯৩, ফাতাওয়া শামী ৬/৬৩, ফিকহুল বুয়ূ’ ১/৫০৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৭৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/২৬১)

**(খ)** স্বামীর উপার্জন হারাম হলে স্ত্রীর জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খোরপোষ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। আর এর গুনাহ তার স্বামীর উপর বর্তাবে। কিন্তু এ প্রয়োজন পরিমাণ খোরপোষ থেকে কাউকে হাদিয়া দিলে জেনেশুনে তা গ্রহণ করার অবকাশ নেই। সন্তান যদি বালেগ ও কর্মক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য বাবার হারাম উপার্জন থেকে ভোগ করা জায়েয নেই। আর যদি নাবালেগ হয় অথবা বালেগ হয়েও কর্মক্ষম না হয় এবং তার জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন হালাল উপায়ও না থাকে, তাহলে তার জন্য বাবার হারাম উপার্জন থেকে প্রয়োজন পরিমাণ খোরপোষ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। তেমনিভাবে স্ত্রীর জন্য হালাল জীবিকার অন্য কোন ব্যবস্থা থাকলে স্বামীর উপার্জন থেকে খোরপোষ গ্রহণ না করাই উত্তম।

সর্বাবস্থায় স্ত্রী-সন্তানের কর্তব্য হলো, তাকে হারাম উপার্জন থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং তার হিদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ করা। (ফাতাওয়া শামী ৫/৯৯, ৬/১৯১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২০/১৪৪)

**আহলিয়া উমর ফারূক**
**মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

**৩৫৫ প্রশ্ন :** আমার ও আমার স্বামীর যৌথ উপার্জনে আমাদের সংসার চলে। আমি ইবনে সিনা হাসপাতালে আল্ট্রাসনোগ্রাম রুমে ডিউটি করি। আমার একটা ছেলে মাদরাসা হিফয বিভাগে পড়ে। একদিন হঠাৎ সে মাদরাসা হতে পালিয়ে যায়। সে দিনই তাকে খুঁজে পাই। খুঁজে পাওয়ার পূর্বে আমি বলেছিলাম, আল্লাহ! যদি আমি ছেলেকে খুঁজে পাই তাহলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যাবো। কিন্তু পরে আর চাকরিটা ছাড়া হয়নি। কিছুদিন পর ছেলেটা আবারও মাদরাসা থেকে পালিয়ে যায়। এবার আমি জায়নামাযে বসে কুরআন শরীফ সামনে রেখে বলেছিলাম, ‘আল্লাহ! আমি এই শেষবারের মতো আপনার কাছে ওয়াদা করছি– ছেলেকে ফিরে পেলে আমি চাকরিটা ছেড়ে দিব।’ পরে ছেলেকে খুঁজে পাই। কিন্তু এ বারও আমি আর্থিক সমস্যার কারণে চাকরিটা ছাড়তে পারছি না। এদিকে ছেলে এখন বলছে যে, সে আর ঢাকায় পড়বে না, গ্রামে গিয়ে চরমোনাই মাদরাসায় পড়েবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো,

**(ক)** ছেলেকে কি হিফয পড়াবো?

**(খ)** আল্লাহর কাছে কৃত ওয়াদা ভঙ্গের বিধান কী?

**(গ)** চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে কী করবো?

**উত্তর : (ক)** সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া প্রত্যেক পিতা-মাতার ঈমানী দায়িত্ব। সুতরাং আপনি আপনার ছেলেকে হিফয পড়াবেন। কেননা হাফেযে কুরআন ও তার পিতা-মাতা সম্পর্কে হাদীসে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়লো, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে গেছে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২০৯৫)

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে এবং তার উপর আমল করবে, তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন একটি মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলো অপেক্ষা বেশি হবে। যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরে হয়! সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে কুরআনের উপর আমল করে তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা! (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৪৫৩)

তবে আপনার ছেলে যদি হিফয পড়তে না চায় তাহলে প্রথমে তাকে ভালোভাবে বুঝাবেন এবং প্রয়োজনে শাসন করবেন। কিন্তু তাকে এমন শাসন বা চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, যাতে সে মাদরাসায় পড়া ছেড়ে দেয়। কেননা হিফয পড়া ফরযে আইন নয়। এজন্য সেই সূরতে আপনার করণীয় হলো, তাকে কিতাব বিভাগে ভর্তি করে দেয়া। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২০৯৫, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৪৫৩, ১৪৬৪, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৪৫২, ফাতাওয়া শামী ১/৫৩৮)

**(খ)** শরীয়তের দৃষ্টিতে মান্নত সংঘটিত হওয়ার জন্য মান্নতকৃত কাজটি ইবাদত-বন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি শরীয়তে এ কাজটির সদৃশ অন্য কোন ফরয বা ওয়াজিব বিধান বিদ্যমান থাকাও পূর্বশর্ত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত চাকরি ছেড়ে দেয়ার মান্নতটি উল্লিখিত শর্তানুযায়ী সংঘটিত না হওয়ায় তা পুরা করা ওয়াজিব নয়। অবশ্য সম্ভব হলে আল্লাহ তা‘আলার সাথে কৃত এ ওয়াদা পূর্ণ করা উচিত। আর বিকল্পভাবে ঘরের ভেতর থেকে অন্য কোন হালাল উপায়ে আয়-রোজগার করার ফিকির করুন। (ফাতাওয়া শামী ৩/৭৩৫, ৭৩৬, ৭৪০, বাদায়িউস সানায়ে’ ৬/৩৩৬)

**(গ) আপনার চাকরির বিধান**

আল্লাহ তা‘আলা মহিলাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে। তারা ঘরে অবস্থান করে স্বামীর খিদমত করবেন এবং সন্তানদেরকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও প্রাথমিক দীনী শিক্ষা দিবেন। মুসলিম নারীর জন্য নামায যেমন ফরয অনুরূপ পর্দাও ফরয। উপরন্তু ইসলাম মহিলাদেরকে জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে। তার জীবিকার দায়িত্বভার বিবাহপূর্ব সময়ে পিতার উপর, বিবাহোত্তর স্বামীর উপর, অতঃপর সন্তান বা অন্য ওয়ারিশদের উপর অর্পণ করেছে।

এসব লোকের উপস্থিতিতে পুরো জীবনে জীবিকার কোন ভাবনা তার করার প্রয়োজন নেই। ইসলাম তাকে এতো বড় দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে অগণিত স্বার্থে ঘর থেকে বিনা প্রয়োজনে বের না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে খুব তাগিদের সাথে।

এমতাবস্থায় জীবিকার উল্লিখিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ঘরের বাইরে গিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানে পর্দার সাথেও চাকরি করা শরীয়ত পছন্দ করে না।

এখন আপনার জন্য আবশ্যক হলো, উক্ত চাকরি ছেড়ে দেয়া এবং আপনার স্বামীর জন্য উচিত এমন কোন হালাল চাকরি বা পেশার ব্যবস্থা করা, যার দ্বারা আপনাদের সংসার ভালোভাবে চলে।

আর যদি এমন চাকরির ব্যবস্থা না হয় এবং একান্তই আপনার চাকরি করতে হয়, তাহলে শরয়ী পর্দা রক্ষা করে সাময়িকভাবে চাকরি করতে পারবেন। তবে চিন্তা-ফিকির রাখতে হবে যেন ঘরে থেকে হালাল ইনকামের কোন ব্যবস্থা করা যায়। (সূরা নিসা- ৩৪, সূরা আহযাব- ৩৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৭৩, ফাতাওয়া শামী ৩/৫৩৬, ৬০৩, আহকামুল কুরআন লিত-থানবী ৩/৪১৬, ৪১৮, ৪৭১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৮৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২৮)

# কিশোর প্রতিভা

## অপ্রত্যাশিত নেয়ামত

পহেলা যিলকদ, শুক্রবার। গভীর রাত। ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর ছুঁই-ছুঁই। হযরত মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসঊদ সাহেব হুযূরের কামরার সামনে দরসে মুসলিম মুতালা'আ করছিলাম। হঠাৎ দেখি, কয়েকজন তালিবে ইলম তৃতীয় তলার বারান্দার রেলিং ধরে নিচের দিকে কী যেন দেখছে। ভাবলাম, হবে কিছু হয়তো। আমি আমার কাজে মনোযোগ দিলাম।

বাবুনগরী...। আওয়াজটি কানে আসতেই নিজের অজান্তে দাঁড়িয়ে গেলাম। ছুটে গেলাম রেলিংয়ের পাশে। নিচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম সময়ের সাহসী কণ্ঠ, আকাবির আসলাফের চেতনার ধারক, শাইখুল হাদীস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দা.বা. গাড়ি থেকে নামছেন। বাতির আলোয় তার নূরানী চেহারা ঝলমল করছিলো। এদিকে কিছু তালিবে ইলম হযরতকে নিয়ে আসার জন্য হুইলচেয়ার নিয়ে নিচে নেমে গেলো। হুযূরকে দ্বিতীয় তলায় মুফতী সাহেব হুযূরের কামরায় নিয়ে আসা হলো। অনেকেই হুযূরের সঙ্গে সালাম-মুসাফাহা করলো। আমরা যারা তখনো এ সুযোগ পাইনি তিনি তাদেরকে বঞ্চিত করলেন না– উচ্চস্বরে সালাম দিলেন। আমরাও শ্রদ্ধাভরে সালামের উত্তর দিলাম। মেহমানদারী গ্রহণ শেষে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

জামি'আর মসজিদুল আবরারে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামাযের পূর্বেই এক তালিবে ইলম ভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, বাদ ফজর তিনি বয়ান করবেন। এজন্য সামনের কাতারেই বসেছিলাম। নামাযের পর জামি'আর উস্তাদ মাওলানা শফীক সালমান সাহেব হযরতের সামনে জামি'আর পরিচয়, ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ২০১৩ সনে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে জামি'আর সরব উপস্থিতি, উল্লেখযোগ্য অবদান, আহত উলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইলম ভাইদের জন্য চিকিৎসাফান্ড গঠন করে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বারডেমে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় জামি'আর আসাতিযায়ে কেরাম ও ছাত্র কর্তৃক হযরতকে দেখতে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।

অতঃপর হযরতের নাম ঘোষিত হলে তিনি হামদ ও সালাতের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করেন এবং মাওলানা শফীক সালমান সাহেবের আলোচনার রেশ ধরে বলেন, আমাদের দীনী মাদরাসাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো, ইলমে দীন হাসিল করা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা এবং উম্মাহর আমল-আখলাক সংশোধনের জন্য খানকা কায়েম করা। কিন্তু কখনো দীনের প্রয়োজনে মাদরাসা আর খানকার নীরব পরিবেশ ছেড়ে রাজপথের প্রতিকূল পরিবেশেও আমাদের আসতে হয়। অতঃপর হেফাজতের ডাকে সাড়া দিয়ে জামি'আর সরব উপস্থিতি, উল্লেখযোগ্য অবদান, চিকিৎসাফান্ড গঠন করে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বারডেমে হযরতকে দেখতে যাওয়ার জন্য সকলের কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। এরপর হযরত মূল আলোচনা শুরু করেন।

প্রথমেই কুরআনের আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করে তালিবে ইলমদের সীমাহীন ফযীলতের কথা বর্ণনা করেন। তিনি ইলম শিক্ষার মেহনতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেহনত আখ্যায়িত করেন এবং বলেন, 'আমিও একজন তালিবে ইলম।' দীর্ঘ বয়ানের শেষাংশে ছাত্রদেরকে সর্বদা উযূর সাথে কিতাবাদি মুতালা'আ করার নসীহত করেন এবং ভাষাশিক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়ার তাকিদ দেন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবী, উর্দূ, ফারসী ভাষার প্রতিও বিশেষ যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন।

সর্বশেষ জামি'আর প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এবং জামি'আর স্বনামধন্য মুহতামিম হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান দা.বা.-এর সাথে হযরতের সুগভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ার প্রশংসা করেন। জামি'আর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে জামি'আর সকল ছাত্র-উস্তাদসহ গোটা দেশ-জাতি ও মুসলিম উম্মাহর জন্য দু'আর মাধ্যমে আলোচনা সমাপ্ত করেন।

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, তিনি নভেম্বর-২০১৯-এ অনুষ্ঠিতব্য জামি'আর বার্ষিক মাহফিলে তাশরীফ রাখার দরখাস্ত কবুল করেন এবং দারুল হাদীসে বুখারী শরীফের দরসের ব্যাপারেও সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

**মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ ভৈরবী**
**তাকমীল, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা**

## আজো ভুলিনি তোমায়

শৈশবে আমার একমাত্র কামনা ছিলো, প্রতিদিন মায়ের মিষ্টি-মধুর হাসিটি দেখবো পূর্ব দিগন্তে উদিত রাঙা সূর্যের সোনালী আলো দেখার আগে। দেখতামও। কতদিন বলেছি, এসো মা, এইখানে একটু দাঁড়াও; ভোরের রাঙা সূর্যের দিকে তাকাও, আমি দেখবো, ভোরের আলো বেশি সুন্দর, না তোমার মুখের মিষ্টি হাসি! তাতে মায়ের মুখের হাসিটি যেন আরো দ্যুতি ছড়াতো। আমার চিবুকে মমতার কোমল স্পর্শ ছড়িয়ে মা বলতেন, আমার মুখের হাসির আলো যে তোর মুখের প্রদীপ থেকে পাওয়া যায়, বাবা!

আম্মু আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। আমার জন্য কতো মজার মজার খাবার বানাতেন প্রতিদিন। আমি পঁচা কাজ করলে আম্মু বকা দিতেন, পরে আবার আদরও করতেন। রোজ রাতে আম্মু আমাকে গল্প শোনাতেন। আমি আম্মুর হাতে মাথা রেখে ঘুমাতাম। রোজ সকালে আম্মুর হাত ধরে স্কুলে যেতাম, আবার বাসায় ফিরতাম।

একদিন স্কুল ছুটি হয়ে গেলো। সবাই চলে গেলো। আমি অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও আম্মু আমাকে নিতে আসলেন না। একসময় গ্রামের এক চাচা আসলো। আমাকে বাসায় নিয়ে গেলেন। বাসায় গিয়ে দেখি আম্মু বাসায় নেই! চাচাজান বললেন, তোমার আম্মুর শরীর খারাপ, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেদিন নানা-নানুসহ আরো অনেকে আসলেন বাসায়। তাদের সাথে আসলেন আম্মুও। হেঁটে কিংবা গাড়িতে করে নয়, একটা সাদা বিছানায় শুয়ে, সাদা কাপড় জড়িয়ে। আমি নানুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম– আম্মুর কী হয়েছে? নানু কোন উত্তর দেননি। খালামনি বলেছিলেন, আম্মু অসুস্থ, তাই ঘুমিয়ে আছে। আম্মুর অনেক ঘুমের প্রয়োজন।

কেউ যেন ঘুমের মাঝে আম্মুকে বিরক্ত করতে না পারে সেজন্য মাটির মধ্যে একটি ঘর বানিয়ে আম্মুকে রেখে দেয়া হয়। তারপর কতদিন পার হয়ে গেলো; আম্মুর ঘুম আজও ভাঙলো না!

একটা সময় ছিলো, যখন সবকিছু সবুজ-সতেজ মনে হতো। এখন প্রতিটি জিনিস কেমন যেন সজীবতা, সতেজতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন আর আগের মতো এই সুন্দর পৃথিবী উজ্জ্বল মনে হয় না। কেমন যেন ঝাঁপসা ঝাঁপসা মনে হয়। নিজেকে অনেকটা অন্যরকম লাগে। অন্য ছাত্রদের সামনে নিজেকে অনেক ছোট অনুভব করি; অনেক অসহায় লাগে। ফ্যালফ্যালিয়ে শুধু চেয়ে থাকি। অন্যের হাসি-আনন্দ দেখে ঈর্ষা জাগে, আমারও হাসতে ইচ্ছে করে। আমারও মন চায় অন্যদের মতো মা-বাবার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে। কিন্তু আমি জানি, এগুলো নিছক কল্পনামাত্র। তবু কেন যেন মন চায়, মা-বাবার হাসিমাখা দু'টি মুখ দেখতে। তাদের একটু সান্নিধ্য পেতে। কিন্তু তারা তো চলে গেছেন অনন্তের পথে, আল্লাহর কাছে। সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তাদের একটি নজর দেখাও। প্রভুর দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন তাদের উভয়কে আপন জান্নাতে আশ্রয় দেন। তাদের কবরের উপর যেভাবে ফুল ফুটে আছে কবরের ভেতরেও যেন ফুল ফোটে। আমীন।

তোমাদের হারানোর পরও গর্বভরে বলছি, মামণি! তোমার জীবন থেকে আমি পেয়েছি জীবনের জন্য অবিচলভাবে সংগ্রাম করে যাওয়ার প্রেরণা। আজ তুমি নেই; কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাই জীবন সংগ্রামের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে, তোমার জীবন থেকে আমি পেয়েছি জীবন সম্পর্কে নতুন শিক্ষা এবং পথ ও পাথেয় সম্পর্কে নতুন চিন্তা এবং পথের মনযিল সম্পর্কে নতুন চেতনা। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মামণি! আমি তোমাকে কখনো ভুলবো না, তোমাকে ভোলা যায় না!

**মুহাম্মাদ ফুয়াদ হাসান**
**ইবতিদায়ী সানী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া**

## তোমাকে মনে পড়ছে দাদুভাই!

হঠাৎ কানে ভেসে এলো, এক সহপাঠীর দাদুভাই ইন্তিকাল করেছেন। হৃদয়টা তখনই বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেলো। ধীরে ধীরে আরও প্রকট আকার ধারণ করলো। এক-এক করে একসময় আমার স্মৃতির অ্যালবামে জ্বলজ্বল করে উঠলো আমার চলে যাওয়া দাদুর সেই মুহূর্তগুলোর– যখন আমি ছোট্ট শিশু ছিলাম। আর আনমনে আমি দাদুকে বলছিলাম, দাদু! তুমি হৃদয় থেকে আমায় ভালোবাসতে! স্নেহ-মমতার চাদরে সদা আগলে রাখতে। সেই ছোট্ট হৃদয়ের ছোট্ট ছোট্ট ব্যথা-বেদনাগুলো স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘুঁচিয়ে দিতে। বিভিন্ন প্রয়োজনে যেখানেই যেতে, তোমার ঐ কোমল কাঁধে আদর করে আমায় বসিয়ে নিতে।

কিন্তু দাদুভাই! তুমি এখন আমাকে ছেড়ে চলে গেছো দূরে, বহুদূরে। পরপারের অজানা জগতে । আর আমি তো এখনো ব্যথিত হই; কিন্তু কেউ আর আসে না সেই ব্যথাগুলো আদর-সোহাগে ধুয়ে দিতে, হৃদয়ে চেপে রাখা নীল বেদনাগুলো স্নেহ-মমতায় মুছে দিতে। তোমাকে হারিয়ে হৃদয়টা আজও শুধু হাহাকার করে। স্মৃতির পাতায় শুধুই তোমাকে খুঁজে ফিরে। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ গত হয় শুধু বিষণ্ণতায়। অসহায় মন ডুকরে ডুকরে বারবার কেঁদে ওঠে তোমাকে হারানোর বেদনায়। তোমাকে আজ খুব মনে পড়ছে দাদুভাই!

মনে পড়ে যখন একটু বড় হলাম, কাঁধে ছোট্ট একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে মাদরাসায় যাওয়া শুরু করলাম, তুমি ঘরের আঙিনায় বসে আমার পথপানে কেমন ফ্যালফ্যাল নয়নে চেয়ে থাকতে। মনে হতো, সাধ্য থাকলে এখনো আমাকে মাটিতে পা ফেলতে দিতে না! মাঝে মাঝে ঐ বারান্দায় পাটি বিছিয়ে শুয়ে থাকতে। আমায় দেখে আদরমাখা কণ্ঠে একটি ছোট্ট ডাক দিতে! সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যখন আমি ছুটে আসতাম– তুমি কাছে টেনে নিতে। আদর করে কাঁধে তুলে নিতে। আর সর্বদা একটি ছোট্ট উপদেশ দিতে– দাদুভাই! অনেক বড় হতে হবে। সবার প্রিয় হতে হবে। পারবে তো!? তোমার সেই ছোট্ট উপদেশকে পাথেয় করে একটি মুচকি হাসি উপহার দিয়ে ছুটে যেতাম মাদরাসায়।

দাদুভাই! তোমার বুকে লালন করা সেই স্বপ্ন আজ সত্যি হয়েছে! তোমার আদুরে তিন নাতি আজ কুরআনের হাফেয হয়েছে। মানুষের প্রিয় হয়েছে। আজ যদি তুমি এ ধরায় থাকতে তাহলে অনেক খুশি হতে! অনেক আনন্দিত হতে!

কিন্তু আফসোস! আজ তুমি নেই। তোমার বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠলো। চলে গেলে অনেক দূরে। সবাইকে কষ্টের সাগরে ভাসিয়ে। দাদুভাই! তোমার সেই স্মৃতিগুলো মিশে আছে আমার জীবনের পরতে পরতে। সেই স্মৃতিগুলো এই ছোট্ট হৃদয়কে আজও কাঁদায়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে তোমাকে হারানোর বিরহ ব্যথায়।

তোমাকে আজ খুব মনে পড়ছে দাদুভাই! জানি না, চিরস্থায়ী ঐ জগতে কেমন আছো তুমি! প্রতিটি মুহূর্ত তোমার কেমন কাটছে সেখানে? তবে আশা করি অনেক সুখে আছো। জান্নাতী পাখি হয়ে ডানা মেলে স্বপ্নের সেই সবুজ উদ্যানে।

দু'আ করি– তাই যেন হয়। হে পরওয়ারদেগার! আমার দাদুভাইকে তুমি আপন রহমতের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দাও। তাকে স্বপ্নে ঘেরা ঐ সবুজ নীড়ের অতিথি করে নাও। তোমার নিকট এটাই এই ছোট্ট হৃদয়ের একান্ত আকুতি।

**মুহাম্মাদ আবিদ হাসান**
**শিক্ষার্থী, আশরাফুল মাদারিস, সতিঘাটা, যশোর**

## দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

# রাবেতা কার্যালয়

**জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া**

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ,

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

**ই-মেইল :**

rabetaar@gmail.com

**মোবাইল**

০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭, ০১৯১২০৭৪৪৯৫